

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০/বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : বারো টাকা

সিং তোকে খুব পছন্দ করে। তাকে একবার ফোন করে দেখবি। যদি ভি আই পি কোটায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের টিকিট মেলে।

সাজেশনটা খুব লাগদার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিন্তা করে ফেললাম প্লেনে এক পিঠের ভাড়া বড়জোর এক এক জনের ১৮০ টাকা। ছোটদের অর্ধেক। ছ-জনের যাতায়াতেই লাগবে আঠারো শ টাকা। তারপর বাগডোগরা যেতে অন্তত এক হপ্তার জন্য একটা গাড়ি চাই। গাড়ি ভাড়া প্লাস পেট্রল মানে আরো একটি হাজার টাকা। এর ওপর খাওয়া-দাওয়া, ডাকবাংলো ভাড়া কিছু না হলে আরো হাজার খানেক। মাইনে, বোনাস, বাড়তি লেখার টাকা মিলিয়েও তো হিল্লে হবে না। নির্মল বড়লোক। ওর পক্ষে সব খরচ বহন করা সম্ভব। কিন্তু ওর অ্যাকাউণ্টে সব? নিজেকে বড় ছোট লাগল। যাকগে সে সব পরে ভাবা যাবে। আগে নির্মলের অ্যাডভাইজটা কাজে লাগাই। ফোন তুলে ছটা নম্বর পর পর ঘুরিয়ে গেলাম—২৩৫৮৪৬। একবারেই পেলাম। ওপাশে অপারেটরের গলা ভেসে এল: রাজভবন।

: রাজ্যপাল টি এন সিংকে একটু লাইনটা দিন।

: কে বলছেন?

কাগজ আর নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম আমি।

: রাজ্যপাল বাইরে গেছেন।

: তাহলে একবার রাজ্যপালের ডেপুটি সেক্রেটারি এন ভি জগন্নাথনকে দিন।

পরিষ্কার বাংলায় ওপাশ থেকে ভেসে এল জগন্নাথনের গলা: কি ব্যাপার?

বললাম: বৌ বাচ্চাদের নিয়ে একটু বেড়াতে যাব জলপাইগুড়ির জঙ্গলে। রাস্তা নেই। ট্রেন নেই। থাকার মধ্যে শুধু প্লেন। ছ'টা টিকিট চাই।

ডুন আর সেণ্ট জফেন্সের ছাত্র, পাটনার প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির ছেলে সেকেণ্ড দশেক ভেবে নিয়ে বললেন কাল বেলা বারোটায় ফোন করুন। দেখি কি করতে পারি। ওয়েষ্টবেঙ্গল ক্যাডারের বলে বাংলাটা ওর দারুণ রপ্ত।

মনটা দমে গেল। এই দেখি কি করতে পারি শুনতে শুনতে কানটা পচে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখেছি কেউ আর কিছু করতে পারে না। জগন্নাথনকে বলিনি ওকে ফোন করার আগে শান্তিদার কাছে যাওয়ার আগে কলকাতার ডি সি ট্রাফিক কমলেশ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। একটা গাড়ি চাই। ভাড়া দেব। ক্যালকাটা টু গরুমারা অ্যাণ্ড ব্যাক। বহুদিনের

পুরানো বন্ধু। সব শুনে বললেন গাড়ি একটা অ্যারেঞ্জ করে দেব ঠিকই, কিন্তু যাবেন কি করে, ন্যাশনাল হাইওয়ে থারটি ফোর নর্থ ও সাউথ বেঙ্গলের যোগাযোগের একমাত্র রুট ফেটে ফুটে চৌচির। কোন গাড়ি এমন কি সরকারী রিলিফের গাড়িও যেতে পারছে না। চুপ করে চলে এলাম।

এদিকে গরুমারা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি প্রায় একমাস আগে। রাইটার্স ফরেস্টের ডেপুটি সেক্রেটারি অমল গুপ্তের কাছে গিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলাম। উনি ও অ্যাপ্লিকেশনের ওপরেই সঙ্গে সঙ্গে চিফ কঞ্জারভেটর অফ ফরেস্ট সুবল সখা মণ্ডলের নামে একটা নোট পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। এসব ১২ সেপ্টেম্বরের কথা। নিয়ম অনুযায়ী সি সি এফ চিঠিটা গরুমারার ডি এফ ও-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রিজারভেশন চারট জেনে নিয়ে তবে অনুমতি দেবেন গরুমারার ডি এ এফ ও। তিন সপ্তাহেও চিঠির কোন জবাব পেলাম না। তখন একদিন হাজরা রোডে সেণ্ট্রাল গভরমেণ্টের ফরেস্ট অফিসে গিয়ে কঞ্জারভেটর অব ফরেস্ট অমল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। বয়সে অন্তত বছর বারো চোদ্দ বড হবেন। অসম্ভব সৎ মানুষ। আমাদের সামনেই লাইটনিং কলে ডি. এফ ও-র সঙ্গে কথা বলে বললেন, গরুমারা যদি কোন কারণে নাও হয় তাহলে চাপড়ামারি বা কুস্তিমারি ডাকবাংলো যাতে আপনারা পান তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আরো শুনলাম ডি. এফ. ও চেষ্টা করছে রাজ্য-সরকার ছেড়ে সেণ্ট্রাল গভরমেণ্টে অমলদার অফিসে আসার। ফলে নিশ্চিন্ত হয়েই দু বন্ধু বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় নেমে নির্মল বলল : দেখ গোটা উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে আমার ঘোরা। ওখানে সত্যিকারের ফরেস্ট রেস্ট হাউস বলতে আসলে দুটি—হলং আর গরুমারা। হলংটা টুরিস্ট ট্রানজিস্টর আর ভি আই পিদের ভিড়ে থার্ড ক্লাস হয়ে গিয়েছে। সেই তুলনায় গরুমারা ঢের নির্জন। তাই খাঁটি ভি আই পিদের ট্রিটমেণ্টের জন্য গরুমারাটা ওরা কখনোই বাইরের লোকদের দিতে চায় না। যে করেই হোক গরুমারাটা চাই।

ভি আই পি মানে তো খানদানী ব্যাপার। সরকারী পয়সার শ্রাদ্ধ। সরকারী কর্তারা তো এক পয়সাও ভাড়া দেবেন না। অথচ আমাদের মত বেসরকারী লোকের ট্যাক্সের টাকায় তৈরী বাংলো পড়ে থাকবে, টাকা দিয়েও যেতে পারব না—এ কেমন কথা? তক্ষুণি ছুটলাম লালবাজারের পেছনে সি আই টি বিল্ডিংয়ে চিফ কঞ্জারভেটর অব ফরেস্টের অফিসে। বিকেল তখন

পাঁচটা। পঞ্চমীর দিন। সুবলবাবু ঘরে ছিলেন। সব শুনে বললেন, সে কি গরুমারার ডি এফ ও আপনাদের কিছু জানান নি।

বললাম : না।

সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোকে ডেকে ডিক্টেশন দিলেন : মাই ডিয়ার, সাব : রিজারভেশন অব গরুমারা ফরেষ্ট রেস্ট হাউস। প্লীজ রেফার টু মাই দিস অফিস নম্বর ১৩৩৬৫। পি আর ও। থ্রি এইচ—১ ডেটেড ১৮-৯-৭৮ অ্যাণ্ড সেণ্ড দ্য বাংলো পাস টু শ্রী·········অ্যাট অ্যান আরলি ডেট, ইফ নট ডান অলরেডি।

যাক একটা দিকে অন্তত নিশ্চিন্ত হলাম। তখুনি নির্মলের সেই বজরামারকা জিপে চড়ে বেরোলাম কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। ব্যাটা নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে আমার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। বিভিন্ন বই-এর জন্য বিভিন্ন পাবলিশারের কাছে কিছু পাওনা ছিল। যার কাছেই যাই সেই বলে ত্ু'লাখ টাকার বই জলে ভিজে গিয়েছে বা ষাট হাজার টাকার কাগজ জলে ভিজে ডাব। একেবারে সত্যি কথা। কিন্তু এত কষ্টের ভেতরেও কিন্তু কেউ শুধু হাতে ফেরাল না। বেঙ্গল পাবলিশারসের ময়ুখ বসু দিল, আটশ টাকা। অনন্য প্রকাশনের হীরক রায় দিল বারোশ টাকা। একাডেমী পাবলিশারসের বিমল ধর দিল পাঁচশ টাকা। অর্থাৎ আড়াই হাজারের প্রভিশন হল। এখন নির্মল বাকিটা ম্যানেজ করবে।

পরের দিন ঠিক তুপুর বারোটায় ফোন করলাম জগন্নাথনকে। মিষ্টি করে বলল সকাল থেকে চেষ্টা করছি ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সকে ফোনে ধরার। পারি নি। তাই স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে আই এ সি-র স্টেশন ম্যানেজার দেববর্মনকে চিঠি পাঠিয়েছি। আপনি তিনটে থেকে সোয়া তিনটের মধ্যে একবার আসুন।

একবার মনে হল, এভাবে না গেলেই কি নয়। এদিকে রজনী ফুঁসছে। নির্মল বলল ওর বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। অমু স্বাধীনচেতা। কিন্তু কেউ তার ওপর খবরদারি করুক—এসব বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। ও যাবে না। তবে নির্মল ম্যানেজ মাস্টার। ডান হাতের ফাঁকে একটা গরম চারমিনারে কলকে প্রসেসে টান দিয়ে বাঁ চোখটা ছোট করে বলল, কিছু ভাবিস না, চেষ্টা চালিয়ে যা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলুন মশাই এসব কথা লেখা কি ঠিক হচ্ছে। কোথায় জঙ্গলের গল্প আপনারা শুনবেন—না, আমি একটা নতুন ধরণের জঙ্গলের গল্প ফেঁদে বসছি।

কিন্তু নিরুপায়। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত। কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। তার আগে বলে নিই, এই যে লিখছি শুনতে পাচ্ছি বহু দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে মেঘের ডাক ভেসে আসছে। সব পাখীর নাম তো জানি না, চেহারাও চিনি না। তারা আমার চার ধারে নানা ধরণের গান গেয়ে চলেছে। এখন বিকেল পৌনে তিনটে, নির্মলের অ্যারেঞ্জমেণ্ট ত্রুটিহীন। রান্নাবান্না সব করিয়ে নিয়েছে। সবাই খেয়েছে। দূরে ডাকবাংলোর একটা ঘরে নির্মল আর অনু ওদের ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার স্ত্রী রজনী আর তিন্নি এইমাত্র খেয়েদেয়ে টাওয়ারে এসে উঠল। যা চেয়েছিলাম তা আর হল না। চেয়েছিলাম সবাই মিলে গল্প করব, আড্ডা মারব। রজনীর সন্দেহ, অনুর অভিমান পাহাড়ের মত জঙ্গলের মত আমাকে দূরে সরিয়ে দিল। খেতে ইচ্ছে করছে না। লিখছি আর একটু একটু পান করছি। জানি এই লেখা যখন ছেপে বেরোবে তখন রজনী আমার ওপর আরো চটে যাবে। সত্যিই হয়ত আমাকে ত্যাগ করবে। তবু এটা তো ঠিক আমি চেয়েছিলাম, এই মুহূর্তে যখন পাখিরা জঙ্গলে সেতার আর সরোদে তান তুলেছে, মাথার ওপর লাস্থনির ছায়া ম্লান হয়ে আসছে তখন অনু অন্তত একটিবার আমার পাশে এসে চুপটি করে বসুক। কোন কথা নয়। কথায় কি সব বলা যায়। একবার বিয়ে হয়ে গেলে একটা মানুষের জীবন যেন জেলখানায় পরিণত হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। তবু লাইফারদের চৌদ্দ পনেরো বছর পরে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু একটি বিবাহিত পুরুষ কি নারী. এ সমাজে কোন মুক্তিই আর কোন দিন পায় না। আশাই করতে পারে না। আশা করাটাই অন্যায়—সামাজিক অপরাধ। তবে যে কবি সাহিত্যিকেরা যুগ যুগ ধরে ঘটা করে প্রেমের বন্দনা গেয়ে এসেছেন। সমস্ত মিথ্যে। ব্যাপারটা নিতান্ত স্বার্থের। আমার স্ত্রী রজনী টাওয়ারের রেলিং-এর ধারে কাঠের বেঞ্চে টানটান হয়ে শুয়ে আমায় পাহারা দিচ্ছে। অনু বাংলোর ঘরে নির্মলের পাশে শুয়ে। ভালোবাসা বা প্রেম মানে কি শুধু সামাজিক অধিকার? মন্ত্রের জোর? তবে তো আদিম সমাজ থেকে আমরা এক ইঞ্চিও এগোইনি। এসব কথা লেখা ঠিক হয়েছে কিনা জানি না। তবে এটা জানি জঙ্গলে এসেও শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষকেই খোঁজে। মনে আছে পালামৌর জঙ্গলে একবার আমি আর নির্মল ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত নেতারহাটে গিয়েছিলাম। সেখানে আলাপ হয়েছিল রাঁচি হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইঞ্জিনিয়ার অশোক বণিক আর তার বৌ কৃষ্ণার সঙ্গে। কৃষ্ণার চেহারাটা

ঠিক অম্বুর মত। যেদিন চলে আসব, সেদিন অনেক ইতস্তত করে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনারা কি এভাবেই একলা একলা ঘোরেন ?

প্রশ্নটার মানে সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই ঠিক করেছিলাম নেকস্ট টাইম আমরা আমাদের কৃষ্ণাদের নিয়ে বেড়াতে আসব। তখন কি জানতাম এত সন্দেহ, এত অবিশ্বাস, এত ঘৃণা, এত অপমান এই সবুজ জঙ্গলটাকে পুড়িয়ে খাক করে দেবে। এই বাংলোয় আজই আমাদের প্রথম দিন। ভাবতেও ভয় হয় কি করে আর ছটা দিন কাটবে ? দেখা যাক। প্রকৃতি যদি হার না মানে, তাহলে আমরা যারা প্রকৃতিরই আত্মজ-আত্মজা তারা কি হেরে যাব। বাকি কথাগুলো আজ আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেয়েছে, ঘুম পেয়েছে, ভীষণ ক্লান্ত। মনে দেহে। যদি পারি রাতে মোমের আলোয় আবার কলম ধরব। না হলে কাল সকালে।

গরুমারার দিনপঞ্জী :

৮ অক্টোবর ! সপ্তমীর রাত।

সন্ধ্যার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ওয়াচ টাওয়ারের বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করছিলাম বিকেল থেকে, কখন লবণ ঢিবিতে মুখ বদলাতে আসবে সম্বর, হরিণ বা বাইসন। একটু আগেও আকাশ ছিল পরিষ্কার। টিপিক্যাল শরৎকালের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। দুধে ধোওয়া। দূরের নদীর অপর পাড়ে সল্ট লিক ছাড়িয়ে সবুজ ঘাসের জঙ্গলে কাশ ফুলের জঙ্গল। বিকেলে নির্মল যত্ন করে যে মুরগীগুলোকে চাল জল খাওয়াচ্ছিল, তাদেরই একটা এতক্ষণে ডাকবাংলোর মালি রামের রসুইখানায় তৈরি হচ্ছে এ এক বিচিত্র ব্যাপার। যে জঙ্গলেই যাই, চৌকিদার, মালি বা জমাদার কেউ না কেউ রাম নামের অধিকারী। ফুট চার, সাড়ে চার হাইট। পরণে খাকি হাফপ্যাণ্ট। সামনের দুটো বোতাম আবার নেই। উর্ধাঙ্গে একটা হাতকাটা গেঞ্জি। কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। কারণ চৌকিদার সাহাব অসুস্থ, ছুটিতে তার পারমিশন না পেলে বাইরের টুরিষ্টদের খিদমদ্গারী অসম্ভব। সম্ভব করল নির্মল। একটি দু টাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, যাবার আগে খুশী করে দিয়ে যাব। সেই আগাম খুশীর আনন্দে মালি রাম এখন রান্না করছে। লাম্বুনি গাছের নীচে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি এখন রজনীর মুখোমুখি। রজনীর একটিই প্রশ্ন : অম্বু আমার চেয়ে কিসে শ্রেষ্ঠ ? কেন তুমি অম্বুকে ভালবাসো ?

কি জবাব দেব ? কি কি মিথ্যা কথা বানাব ? কেমন করে কথার পিঠে কথা সাজাব ? কোন কোন শব্দ পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালে রজনীর কঠিন মুখটাকে অন্তত একবেলার জন্য রমণীয় করে তুলবে ? এ তো তবু নিজের স্ত্রী। এর আগে যে সব মুখ পর পর ফেস করেছি, তাদের রুক্ষ রূঢ় দেখেছি, বিরক্তি ঠাসা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে কথার মালা গেঁথেছি, তার তুলনায় রজনী সত্যিই রমণী, রমণীয়।

জগন্নাথন বলেছিল, তিনটে থেকে সোয়া তিনটের মধ্যে দেখা করতে। নির্মলের ওই বিখ্যাত জিপ নিয়ে রাজভবনের নরম গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই গেটের পুলিশ অফিসাররা এমনভাবে নাক সিঁটকোলেন যে নিজেরই লজ্জা হতে লাগল। ফোন টোন করে যখন ওরা সিওর হলেন, সত্যিই এদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, তখন অনুমতি পেলাম রাজভবনের সিঁড়ি বারান্দায় গিয়ে গাড়ি ভেড়াতে। উর্দি পরা বেয়ারারা অভ্যাসবশত গাড়ির দরজা খুলতে ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল। জিপের তো কোন দরজা নেই। নির্মল আমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা নিয়ে বাইরে মোরাম বিছানো পুব দুয়ারী দরজার কাছে অন্য গাড়ির সারির ভেতর জিপটাকে ভেড়ালো। আমি সটান চলে গেলাম জগন্নাথনের ঘরে। কপাল ভাল। ঢুকতেই জগন্নাথন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এর নাম সন্তোষবাবু। অসাধ্য সাধনে সিদ্ধ পুরুষ। আপনাদের ছটা টিকিটই বুক করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সাত তারিখের ২২১ এ ফ্লাইটে।

একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সোজা ওদের অফিসে গিয়ে ষ্টেশন ডাইরেক্টর দেববর্মনের সঙ্গে দেখা করুন। এই চিঠিটা দিন। ব্যস, তাহলেই সব হয়ে যাবে।

চিঠি তো নয় যেন পাসপোর্ট। উত্তরবঙ্গ নয় খোদ পিকিংয়ে যাওয়ার। কফি খাব কি না ?—জগন্নাথনের প্রশ্নের জবাবে করজোড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনার অনেক চা ও কফি এর আগে ধ্বংস করেছি। আজ আর নয়। নেকষ্ট টাইম।

হেসে জবাব দিল : সে সুযোগ কি আর পাবেন ? এই মাত্র চিফ মিনিস্টারের অফিস থেকে ফোন এসেছিল। আমাকে ওরা বীরভূমে স্পেশাল অ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইন চার্জ অব রিলিফ অপারেশন করে পাঠাচ্ছে। কালই চলে যেতে হবে।

এয়ার লাইন্স অফিসে ঢুকে দেখি সে এক ধুনধুমার কাণ্ড। যেন

ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের শীল্ড ফাইনাল। গোটা একতলাটা মানুষে শুধু থৈ থৈ করছে। ফ্যানগুলো অধিকাংশই অকেজো। কাউণ্টারের কর্মীরা ক্লান্ত, বিরক্ত। এক-একটা কাউণ্টারের সামনে কম করেও হাজার লোকের লাইন।

অসম্ভব। এ লাইনে দাঁড়ালে টিকিট পেতে পেতে পূজো পেরিয়ে যাবে। তাই সটান চলে গেলাম দোতলায় স্টেশন ডিরেক্টর দেববর্মনের ঘরে। গোলগাল মঙ্গোলীয় ফরসা মুখ। সামনের দুটি চেয়ারে আমাদের মত দুজন হতভাগ্য করুণ মুখে বসে। রিভলভিং চেয়ারখানা ঘুরিয়ে দেববর্মন ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জানি চূড়ান্ত অভদ্রতা তবু জগন্নাথনের চিঠিখানা ওর হাতে দিয়ে বললাম, যে করেই হোক ছখানা টিকিটের ব্যবস্থা করুন।

ষষ্ঠীর দিন সকালে অর্থাৎ সাত তারিখ যখন ট্যাক্সিতে চেপে আমরা দুটি পরিবার এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, তখন সেই টিকিট কেনার কাহিনী নির্মল গুছিয়ে গুছিয়ে বৌদের বলছিল। তিন্নি আর বিন্নু চকলেট চিবুচ্ছে নির্মল বলে চলেছে। পরণে নেভি ব্লু রংয়ের জিনের সাফারি স্যুট। চোখে বিশাল একটা সান গ্লাস। ডান হাতের অনামিকা আর মধ্যমার ফাঁকে গরম সিগারেট কলকের পোজে ধরা। ডান ধারের সিটে ড্রাইভার বাঁ ধারে জানালা ঘেঁষে আমি। পেছনের সিটের দু ধারের দুটি জানলায় রজনী আর অনু বিরক্তি মাখানো অন্যমনস্কতা নিয়ে নির্মলকে শুনছে।

: তারপর বুঝলে রজনী, তোমার স্বামী তো আমার জিপখানা নিয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় তোলা তুলতে গেল। এদিকে আমি দেববর্মনের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম এতবড় ক্রাউড জীবনে ও আর কখনো ফেস করেনি। একেবারে দিশেহারা। নেহাৎ রাজ-ভবনের রিকোয়েস্ট। ফেলতেও পারে না। নীচে নেমে এল। কিন্তু এলে কি হবে। টিকিট কোথায়? বাগডোগরার টিকিট যে সই করে, রিলিভার না আসায় ক্ষেপে গিয়ে টিকিটের গোছা ড্রয়ারে পুরে, কেটে পড়েছে। ষ্টেশন ডাইরেক্টরের বাপের সাধ্যি নেই যে কিছু করে। এমন সময় দেখা হয়ে গেল সমরেশের সঙ্গে। ইউনিয়ন লিডার। সি পি এম করে। বহুদিনের পরিচিত। সব শুনে বলল, ডোণ্ট ওরি, পাঁচ মিনিটেই সব হিল্লে করে দিচ্ছি। তা পাঁচ মিনিট নয় আধ ঘণ্টার মধ্যে ছখানা টিকিট সত্যি সত্যি আমার হাতে গছিয়ে দিল। বুঝলে অনু সেদিন সমরেশকে না পেলে আজ আর গরুমারা যাওয়াই হোত না।

ট্যাক্সিটা সি আই টি রোড, কনভেন্ট রোড সব ছাড়িয়ে ভি আই পি রোডের দিকে ছুটছে। নির্মলের শেষ কটা কথায় বড় খারাপ লাগল। স্ত্রীর কাছে যেটুকু বীরত্ব দেখিয়েছিলাম রাজভবনের সুবাদে, এক সমরেশের ধাক্কায় নির্মল সেটুকুও কেড়ে নিল। নিক। ব্যবসা করে, রাজনীতির মহলে বেশ খাতির, ইউনিয়নওয়ালারা সবাই ওকে চেনে। হতেই পারে। শুনছি নির্মল বলছে : সমরেশ কথা দিয়েছে ২২১-এ নয় খোদ ২২১-এই আমাদের তুলে দেবে। ওটা একঘণ্টা আগে ছাড়ে। প্রয়োজন হলে ছটা টি ল্যানটার বা ব্রোকারকে ২২১-এতে পাচার করে দিয়ে আমাদের আগের ফ্লাইটে পাঠিয়ে দেবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পোনে একটা। যদি আগের ফ্লাইটে যেতে হয় তাহলে হাতে আছে আর মাত্র বিশ মিনিট সময়। নির্মলকে সে কথা মনে করিয়ে দিতেই পাগলা যেন ক্ষেপে উঠল। ড্রাইভারকে উসকে, তাড়া লাগিয়ে, বাড়তি বখশীসের লোভ দেখিয়ে বলতে লাগল, যে করেই হোক দশ মিনিটের মধ্যে পৌছোতে হবে।

সর্দারজী ড্রাইভার ডবল বখশীসসমেত কড়কড়ে সত্তরটা টাকা বুঝে নিয়ে দশ মিনিটের ভেতর যখন ইণ্টারন্যাল ফ্লাইটের এরাইভ্যাল গেটে পৌছে দিল তখন হাতে আর সময় নেই। সময় নেই মানে, আমার হাত ঘড়ি বলছে আর মাত্র পাঁচ মিনিট। ঘড়িটা আজই ট্যাক্সিতে ওঠার আগে অনু আমাকে উপহার দিয়েছে। এই উপহার আবার একটা ফ্যাকড়া স্টোরি। আগে প্লেনে তো উঠি, তারপর না হয় ফ্যাকড়া আর তার ব্যাকগ্রাউণ্ডের চর্চা চলবে।

সিকিউরিটি ফিকিউরিটি না মেনে ঠেলাগাড়িতে দু বন্ধুর তাবৎ বোঁচকা-বুঁচকি তুলে দিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম রান ওয়েতে। পেছনে বৌরা। নির্মল টিকিটের গোছা নিয়ে বোর্ডিং কার্ড করাতে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। হাত ঘড়িটা যদি সত্যি কথা বলে তো তাহলে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। একটা পাঁচে প্লেন ছাড়বে। তার আগেই যে করেই হোক সবাইকে নিয়ে ওঠা দরকার। কিন্তু এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গার্ড কেন ছাড়বে। রাইফেল উঁচিয়ে বলে উঠল এই গেট দিয়ে তো যেতে পারবে না। তুম ভি মিলিটারি তো হাম ভি মিলিটারি। চীৎকার করে বললাম, প্লেনটা মিস করলে কি তুমি আমার আঠারো শ টাকা ফেরৎ দেবে? লেগে গেল কাজিয়া।

বৃষ্টি একটু ধরেছে। লাস্থনির ছোট ছোট পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছে।

রজনীর প্রশ্ন এড়ানোর মত সত্য-মিথ্যে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। মাথা ভিজে গায়ের গেঞ্জিটা পর্যন্ত শপ শপ করছে। রজনীর হালকা সিলকের শাড়ি এই অন্ধকারেও টের পাচ্ছি। রাম কাম্পোজ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। চোদ্দ বছর আগে রজনী মেয়েটি আমাকে উন্মত্ত করে দিয়েছিল। ওকে ছুঁয়ে বললাম, বিশ্বাস কর অনুকে আমি ভালোবাসি না। বাসি একমাত্র তোমাকেই। এই তোমার বুক ছুঁয়ে বলছি।

কি অসম্ভব নিষ্ঠুর মিথ্যা। নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করে শপথ করার ভঙ্গিতে এই অরণ্যের নির্জনতায় একটা চূড়ান্ত সত্যকে গোপন করে চলেছি। নির্মল একগাদা ঘুমের বড়ির সঙ্গে এক বোতল রাম গিলে বিকেল থেকে ঘুমোচ্ছে। অসাড়ে। তিন্নি আর বিনু এখন অনুর পাহারায় বাংলোর দোতলার বারান্দায়। টাওয়ারে আসার আগে দেখে এসেছি অনু যেন কি একটা বস্তু সেলাই করছে। ওর শাশুড়ি কাকে কি উপহার দেবেন। বোধহয় কোন আত্মীয়ের বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে। সূঁচ সুতো দিয়ে, কাঁচি নিয়ে সেই সাংসারিক মহান দায়িত্ব পালন করতে করতে একপাশে ঘুমন্ত স্বামী অন্যদিকে দুটি দামাল বাচ্চার মাঝখানে অনু এখন নিঃসঙ্গ। যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে ওরও ইচ্ছা ছিল এই সপ্তমীর রাতে, যখন আকাশ বৃষ্টি হয়ে নামে নি, যখন একটুকরো চাঁদ লাস্নুনির আড়াল দিয়ে জ্যোৎস্নায় সামনের নদী, মাঠ, শাল জঙ্গল ভাসিয়ে দিচ্ছিল তখন আমার সঙ্গে একটু গল্প করতে। কিন্তু রজনীর অবিশ্বাস, সন্দেহ, অধিকারবোধ পাঁচিলের মত আমাদের দুজনকে আড়াল করে রেখেছে। বাংলো থেকে আসার সময় দেখে এসেছি একটা বার্মীজ লুঙ্গির ওপর হালকা পলকা ডটের ব্লাউজ পরে মেয়েটি বুনো ফুলের মত নির্জন নিঃসঙ্গতায় আপনা আপনি ফুটে উঠে ঝরে যাচ্ছে।

সি আর পি গারড কিছুতেই ছাড়ল না। রজনী আর অনু দুজনের মুখ নিদারুণ গম্ভীর। ভাবলাম আমি আবার অসভ্য, দুর্বিনীত, অভদ্র হয়ে উঠেছি। এত তাড়ার কি ছিল? সবাই যখন লাইনে, তখন আমি কে হরিদাস পাল লাইনে দাঁড়াবো না? মুশকিল হয়েছে আমার পেশাটাকে নিয়ে। সর্বত্র লাইসেন্স পেতে পেতে মেজাজ সর্বদাই টং হয়ে থাকে। পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে একদল পেটে-ভাতে খাওয়া মানুষ, যাদের পূর্ব পরিচয় ছিল সাংবাদিক, ষাট সত্তর টাকা মাইনে তাও হয়তো তিন চার কিস্তিতে পেতেন, সংসার চলতো না, স্ত্রীরা অসম্মান করতেন, সুভাষ বোস, জহরলাল নেহরুরা যাদের সঙ্গে অমানুষের মত ব্যবহার করতেন, তাদের সারাজীবনের দধীচি স্যাক্রিফাইসের

সুফল আজ আমরা ভোগ করছি। পঁচিশ হাজারী কাগজ আজ চার লাখ বিক্রি হয়। মন্ত্রিসভা বদলায়। ধমকে বড় বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপন আসে। বার কয়েক ওয়েজ বোরড বসেছে। এখন আমরা মোটা মাইনে পাই। সমাজে খাতির। মন্ত্রীদের তোয়াজ। এম এল এ, এম পি-দের পিঠ চুলকানি। ব্যুরোক্র্যাটদের সদা সর্বদা পিঠ চাপড়ানি। মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

বৃষ্টি এক সময় থেমে গেল। টপ টপ করে লাম্বুনির পাতা, ডালপালা দিয়ে জল ঝরছে। রজনী ভিজছে আমিও ভিজছি। বললাম, কেন এত কষ্ট পাচ্ছ রজনী? তুমি টলস্টয়ের রেজারেকসনখানা পড়েছ? মনে আছে খেলুদ্যফ আর মাসলোভার কথা। হাজার স্যাক্রিফাইস কর, হাজার অনুতাপে বিদ্ধ হও তবু যাকে আমরা চাই তাকে পাই না।

রজনীর চাঁচাছোলা প্রশ্ন: তুমি কাকে চাও? অনুকে না আমাকে? স্পষ্ট করে বল—এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর না।

টাওয়ারের নীচ দিয়ে এই নির্জন রাতে এনডং নদী বয়ে চলেছে। ডাক-বাংলোর পোষা ময়ূর থেকে থেকে ডেকে উঠছে। অজস্র জোনাকী দূরের ঘাসের বনে রক্ত গোলাপের মত ফুটছে। দুটি দলছুট বাইসন দেখলাম টর্চের আলোয় সলট লিকের চারপাশে ঘুরছে। এখন আমার কি করা উচিত? অনু বলেছে ডিপ্লোম্যাট হও; সব মানিয়ে নিয়ে চল। সবাইকে খুশী কর। কাউকে দুঃখ দিও না। কিছু প্রকাশ কর না। কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ। আমারো তো পাপ-পুণ্য বোধ আছে। হয়তো সাজাজিক বোধের চেয়ে স্বতন্ত্র। কত মিথ্যা আর বলব। অনুকেও বুঝি না। ওতো নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসে প্রেম করতে চায়। আমার রাগ অভিমান, দুঃখ আদৌ বোঝে বলে মনে হয় না। দেখুন তো কি সব কথা লিখছি। বই হয়ে বেরোলে রজনী নিশ্চয় পড়বে। ভাববে স্বামীটা একটা লম্পট, পরনারী আসক্ত। কিন্তু আপনারাই বলুন, গোলাপ যার ভাল লাগে সেকি কখনো নীল পদ্ম দিয়ে দুর্গার পূজা করে না?

এদিকে এয়ারপোর্টের রানওয়েতে তুমুল লড়াই চলছে। আমি আমার দলবল, লাগেজ নিয়ে প্লেনে উঠব। সি আর পি গার্ড উঠতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হল, স্থানীয় পুলিশের বড় কর্তা মিত্র মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি যদি অনুমতি দেন তবেই।

দাঁত সব বাঁধানো। মাথা জোড়া টাক। অ্যান্টি-আমাশয় ট্যাবলেটের নিয়মিত সেবক মিত্রমশাই সব শুনে বললেন, জানেন আমি আপনাকে অ্যারেস্ট

করতে পারি। আপনি সিকিউরিটি ল ভায়োলেট করেছেন।

সবিনয়ে বললাম : দয়া করে অ্যারেস্ট করুন। শুধু আমাকে নয় আমার বন্ধু, বন্ধু পত্নী, স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা সমেত। কাল সকালে খবরের কাগজের পাতার কয়েকটা লাইন দখল করুন। তারপর আপনাকে যা দেখার দেখে নেবো। এসব কথা যখন বলছি তখনো জানি চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পঞ্চাশ ষাট বছরের উপোসী একদল সাংবাদিকের সারাজীবনের সুকৃতি এখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে জমে জমে সাংবাদিক স্বাধীনতায় পরিণত হয়েছে!

রজনী রাতের গভীরে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল : বল কিসের চেয়ে অনু আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই একই প্রশ্ন। সেই একই জিজ্ঞাসা—কি উত্তর দেব? দূর থেকে ভেসে আসছে শিমূল, শাল, শিরিষ, ডুমুর আর শ্বেতকাঠের এক বিচিত্র মিশ্রিত গন্ধ। অনেক নীচে বয়ে চলেছে এনডং। নদীর পাড় ঘেষে হাতিদের প্রিয় খাদ্য-আট থেকে দশ ফুট উঁচু পুরুণ্ডি ঘাসের জঙ্গল। খুন করে যে কোন লোক অনায়াসে ওই ঘাসের জঙ্গলে লাশ লুকিয়ে রাখতে পারে, কেউ খুঁজে পাবে না। অদূরেই সেই সল্টলিক। নুন ঢিবির পাশে অজস্র কাশ ফুল বৃষ্টি ধোয়া সপ্তমীর জ্যোৎস্নায় স্বপ্নের মত হয়ে আছে। আর কাশফুল, লাম্বুনি, শাল ও শিরিষ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বিভীষিকার মত গজিয়ে উঠছে লাম্বুনী লতা বা মাইকেনিয়া লতা। হাজার ওষুধ ছড়িয়েও এদের বিস্তার রোধ করা যাচ্ছে না। দিন দিন বেড়েই চলেছে। গোটা বনটাকে প্রায় গ্রাস করতে বসেছে। কোন গাছই ওদের কাছে গাছ নয়। যে কোন গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে তিলে তিলে আসল গাছটাকেই শেষ করে দেয়। ওসব কথা এখানে পৌছে বিট অফিসার যতীন দত্তের মুখে শুনেছি। তাই খানিকটা কাব্য, খানিকটা সত্য ঢাকার চেষ্টায় গলাটা নামিয়ে বললাম : মাইকেনিয়া লতার নাম শুনেছো রজনী?

যৌবনে রজনী যাদের সিওর সুন্দরী বলে তাদেরই দলের অন্যতম ছিল। জীবনে দুর্ঘটনা ঘটে না। ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছিল। রাত নটার সিনেমার টিকিট কাটা। আমি হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব। হঠাৎ আঁচলটা গিয়ে পড়ল গনগনে উনুনে। সিনথেটিক শাড়ি। জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। হাত দিয়ে মুখটা বাঁচাতে গিয়ে চাঁপার মত আঙুলগুলো আর পেটপা গেল পুড়ে। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে কাটিয়ে যখন বেরিয়ে এল তখন সেই রজনী আর নেই। শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস। দেখতে কতটা খারাপ

হয়ে গিয়েছে। লোকে কি বলবে? কে কে ওর আঙুল আর পেট দেখে ঠাট্টা আর বিদ্রূপ করেছে। কে কোন মন্তব্য করেছে। কে ওকে কি বলেছে। সেই রজনী আজ সেই দুর্ঘটনার তিন বছর বাদে আমার হাত জোড়া জড়িয়ে ধরে বৃষ্টি ধোয়া সপ্তমীর রাতে লাম্বুনি গাছের ছায়ায় যে প্রশ্ন করছে তার কি জবাব দেব?

তার চেয়ে অনেক সহজ বলা, শেষ পর্যন্ত আমরা প্লেনে ওঠা সুযোগ পেলাম। একটা পাঁচ নয়, দুটো পনেরোতে ছাড়ল প্লেন। এদিকে প্লেনে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে নির্মলই আবিষ্কার করল, রিটারন ফ্লাইটের টিকিটগুলো তাড়াহুড়োর মাথায় সব ছিঁড়ে গিয়েছে। পরম দুশ্চিন্তার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা আমাদের যাত্রাসঙ্গী ট্র্যাফিক অফিসার বি কে রায়। সঙ্গে ছিল জগন্নাথনের দেওয়া রিটারন ফ্লাইটের টিকিটের 'ওকে' করার জন্য শিলিগুড়ির স্টেশন ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে লেখা একটা চিঠি। রায়কে বেশিদিন চিনি না, মাত্র তিন মাস। ওর ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে কাগজে ছোট একটা নিউজ লিখেছিলাম। অসম্ভব কৃতজ্ঞ মানুষ। আমি চিনতে পারি নি, উনি পেরেছেন। হেসে বললেন, গভর্নর দেখাচ্ছেন আমরা কেউ নই, ছোটখাটো চাকরি করি তাই।

এই সহৃদয় মানুষটিকে কি বলা যায়? তাই টিকিটের গোছাটা রায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, যা ভাল বুঝবেন করবেন। চৌদ্দ তারিখ আমাদের ফিরতেই হবে।

দমদম টু বাগডোগরা—কতটাই বা পথ প্লেনে। স্যানডুইচ কমলালেবুর রস দিয়ে ঠোঁটটা ভেজাতে ভেজাতেই তো সিট বেল্ট আবার বাঁধার নির্দেশ। কিন্তু গোটা জার্নিটাই তেতো হয়ে গেল। বাঁ দিকের তিনটি সিটে বসল অনু, নির্মল আর বিনু। ডানদিকে আমরা। একটা টোটাল অবিশ্বাস কুরে কুরে খাচ্ছে রজনীকে। অনুও ভয় পায়। রজনীকে, নির্মলকেও। কতদূর এগোনো সম্ভব? কতটার পর নির্মলের মত উদ্দাম, পাগল, দুরন্ত, বন্ধুবৎসল মানুষও ঘেন্নায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে?

তিনটে নাগাদ বাগডোগরায় পৌঁছে দেখি, গোটা পোর্টটা গম গম করছে। পনেরো মিনিটের ব্যবধানে পর পর দুটো ফ্লাইট এসেছে। আবার এখুনি একটা ছাড়বে। আমাদের গাড়ি রেডি। কলকাতা পুলিশের দুই ডি-সি স্বরূপ মুখার্জি ও শ্যামল দত্তকে বলে রেখেছিলাম, সাতদিনের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিবি। ভাড়া যা লাগবে সব দেব। দেখলাম কথা রেখেছে।

এয়ার পোর্টের অ্যানটি হাইজ্যাক স্কোয়াডের ইন্সপেক্টরকে নিজের পরিচয় জানাতেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে পোর্টের বাইরে যেখানে শ খানেক গাড়ি ভিড় করে দাঁড়িয়ে তার ভেতর থেকে একটাকে খুঁজে বার করে বললেন, এইটা আপনাদের জন্য বুক করা আছে! নম্বরটা শুধু মনে রাখবেন এ এস এম/২৩১।

ক্যাপটেন রায় আগের ফ্লাইটটা চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। তার কাছেই আমাদের সব টিকিট। নির্মল চলে গেল রায়ের কাছে রিটার্ন জার্নির ব্যবস্থা পাকা করতে। আমি চললাম লাগেজগুলো ছাড়াতে। লাগেজ মানে নির্মলদের একটা বিরাট চামড়ার সুটকেশ আর আমাদের দুটো সুটকেশ—মাঝারি সাইজের।

খাওয়ার আগে দেখতে পেলাম এয়ার পোর্টের লাউনজে পাশাপাশি দুটি সিটে দু দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিষণ্ণ দুটি প্রতিমা বসে। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। ওরা জানে না হয়তো বা ভুলে গিয়েছে আজ ষষ্ঠী, দেবীর বোধন। কাল সপ্তমী দুই বন্ধু সপরিবারে সুখ খুঁজতে বেরিয়েছি। টের পাচ্ছি এই যাত্রায় অসুখই আমাদের যাত্রাসঙ্গী।

অনেক খুঁজে পেতে নম্বর মিলিয়ে যখন সুটকেশগুলো নিয়ে বাইরে এলাম ততক্ষণে গাড়ির দঙ্গল প্রায় সাফ হয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখি সেই এ এস এম-২৩১ নম্বর গাড়িটি অন্য একদল লোক আর তাদের মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, এ কি ব্যাপার এ গাড়ি তো আমাদের জন্য বুক করা। ড্রাইভার নেমে এল ড্রাইভিং সিট ছেড়ে। রোগা, মাঝারি হাইট, কালো, মাথায় ফিল্মি হিরোর মত চুলের গুচ্ছ। পরনে একটা কালো টেরিকটের ট্রাউজারসের ওপর বুক খোলা হাওয়াই শার্ট। বয়স বড় জোর বাইশ কি তেইশ। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে ফিস ফিস করে বলল: আপনাদের স্যার একঘণ্টা ধরে খুঁজছি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। স্পিকারে পর্যন্ত আপনাদের নাম অ্যানাউন্স করিয়েছি। কেউ বলতে পারল না আপনারা এসেছেন কিনা তখন—

আমায় আর কিছু বলতে হল না অ্যান্টিহাইজাকিং স্কোয়াডের সাব-ইন্সপেক্টর মজুমদার পাশ থেকে গর্জে উঠলেন: চোপ মিথ্যেবাদী। তোর কোথায় রিপোর্ট করার কথা ছিল? কেন আন্টি হাইজাকিং স্কোয়াডে খোঁজ না নিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলি?

কথায় কথায় জানতে পারলাম, ড্রাইভার তপন দুপুর থেকে খদ্দের

খুঁজছিল। থাইল্যাণ্ড ফেরৎ তুই বড় ব্যবসায়ী আর তাদের স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বিরাটনগর যাবে—সাড়ে তিনশ টাকায়। হয়তো মালিকের কাছে গিয়ে বলবে আমরা আসি নি, গাড়িটা বসে থাকবে। তাই ভাড়া খাটিয়ে শ তুই রোজগার করেছে। মালিকও হ্যাপি, ওরও টু পাইস হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে হপ্তাভোর ঘুরে তো পাবে মাত্র চারশ টাকা।

এই সব কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটির মাঝখানে কোথা থেকে ছুটে এলেন বাগডোগরা থানার ও-সি কুমায়ুন। পরনে স্টিল গ্রে রঙের নিখুঁত কাটের টেরিকটের ইউনিফরম। বয়স আমাদেরই মত। পঁয়ত্রিশ কি আটত্রিশ। এক মিনিটে সব প্রবলেম জল হয়ে গেল। অন্য যাত্রীদের আর একটি ভাড়া করা প্রাইভেট কারে তুলে দিয়ে আমাদের জন্য বুক করা গাড়িটা পাইয়ে দিলেন। রওনা দিলাম বিকেল তখন চারটে।

নির্মল বলল, দেখ আজ আর গরুমারায় গিয়ে লাভ নেই। অনেক রাত হয়ে যাবে। ওখানকার মালি কাউকেই হয়তো খুঁজে পাব না। নানা ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে আজ রাতটা চল্ হোটেল সিনক্লেয়রে কাটিয়ে কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব।

তাই ঠিক হল। হোটেলে তুখানা ঘরে তুটি বাঘিনীকে বাচ্চা সমেত ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মল আর আমি আমাদের কাজ শুরু করে দিলাম। রজনী তুমি জানো না, সেই রাতে কি ঘটনা ঘটেছিল। প্রেম, ভালোবাসা, কে কাকে কতটা ভালোবাসে তাই নিয়ে তো এত চিন্তিত—ওদিকে আমরা তখন খুঁজেছি জলপাইগুড়ির জঙ্গলের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে। ট্র্যাংকল করলাম। শুনলাম ভদ্রলোক ডাউহিল গিয়েছেন। তবে আজ রাতেই ফিরবেন।

রাত আস্তে আস্তে নিবিড় হচ্ছে। হোটেলের কাউণ্টারে রিসেপশনিস্ট চাবির গোছা ট্যুরিস্টদের হাতে দিতে দিতে ক্লান্ত। ফোন অপারেটর পাগলের মত কখনো শিলিগুড়ি, কখনো জলপাইগুড়ি, কখনো দার্জিলিং-এর লাইন খুঁজছে। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের জজ যশবন্ত সিং এসে হাজির হলেন। সঙ্গে কম করেও এক ডজন সাঙ্গোপাঙ্গো। গোটা হোটেল ওই গেস্টদের নিয়ে ব্যস্ত।

রজনী, এনডং এখন জলে জলে কানায় কানায়। শুনতে পাচ্ছ নদীর শব্দ। ঠিক যেন একটি মেয়ে কলসী ভরছে। আরো দূরে ওই শিমুল, শিরিষ, ডুমুর, শ্বেতীকাঠের গাছপালার আড়াল পুরুণ্ডি ঘাসের ভেতর দিয়ে শাল জঙ্গলের

গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। এই মূর্তি আর এনডং খানিক দূরেই মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে পড়েছে জলঢাকা নদীতে।

নির্মল বলল : বড় টায়ার্ড! একটু চার্মড হয়ে নিই।

কাউণ্টারের বাঁ ধারের করিডোরের গায়েই বার। কয়েকজন টি প্লানটার আর ব্রোকার স্যানডুইচ আর হুইস্কি দিয়ে নিজেদের টাটকা করে নিচ্ছিল। আমরা বার কাউণ্টারের সামনে টুলে গিয়ে বসলাম। নির্মল অর্ডার দিল : দুটো ব্র্যাণ্ডি আর গরম জল। ব্র্যাণ্ডিতে দুটো করে ঘুমের বড়ি কাম্পোজ মিশিয়ে নিয়ে সট করে টেনে নিতেই সারাদিনের সব ঝঞ্ঝাট আর ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। বড় খিদে পেয়েছিল। বার ম্যানেজারকে বললাম দু প্লেট সানডুইচ চাই। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বাচ্চা ছোকরা। বিল কাটতে কাটতে বললে, একটু সময় লাগবে। তবে আমি নিজে প্যান্ট্রিতে যাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারি আপনাদের সার্ভ করব।

ছোকরা টেরও পেল না - ওকেই আমরা সরাতে চেয়েছিলাম। নির্মল মুহূর্তে কাউণ্টারের বেয়ারাকে বলল, কত মাইনে পাও?

খেতে না পাওয়া, কালো শীর্ণ মানুষটি সাদা উরদিতে আপাদমস্তক মোড়া। হাসলে গাল ভেঙ্গে যায়। স্যার মাত্র একশ টাকা।

পকেট থেকে একটি দশ টাকার নোট বার করে বেয়ারার হাতে গুঁজে দিয়ে নির্মল বলল, চট করে চার পেগ ব্র্যাণ্ডি এই খালি বোতলটায় ভরে দাও, সঙ্গে জিনজার এল। বিল কর দু পেগের।

জানি রজনী তুমি তঞ্চকতা পছন্দ কর না। সত্য জানতে চাও। আরো চাও জানতে আমাদের চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন কেন আজ এমনভাবে বিষণ্ণ? কেন তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়? সব বলব একটু অপেক্ষা করো। একটু সময় দাও।

রাত এখন আটটা। যাচ্ছি জলপাইগুড়িতে ডি এফ ও-র বাংলোতে। সঙ্গে সি সি এফ সুবলবাবুর দেওয়া সেই রিমাইনডার লেটার। যা বান আর বৃষ্টি গেছে গত এক মাস। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এমনো হতে পারে যে উনি কোন চিঠিই পান নি। গাড়ি চলছে। নির্মল শুধু একবার ড্রাইভার তপনকে জিজ্ঞাসা করল—কতটা সময় লাগবে?

: পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

: আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি রে। বলেই গাড়ির এক কোণে ওই পাহাড়ের মত দেহটা গড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

তপনকে জিজ্ঞাসা করলাম: হ্যাঁরে সব জেনেও কেন আমাদের ঠকাচ্ছিলি? মুখচোরা লাজুক ছেলে। সব খবর বার করতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। চার ভাই, মা ও বাবা। বাবা রেলে কাজ করতেন, রিটায়ার করেছেন। বড় দু ভাই ভাল চাকরি করেন। একজন কলকাতায়, অন্যজন শিলিগুড়িতে। সেজ ভাই চাকরি খুঁজছে। তপন টাকার অভাবে স্কুল ফাইন্যালের ফিজ জমা দিতে পারে নি। এখন স্থানীয় ডি আই বি ইন্সপেক্টরের জামাই প্রদীপ চৌধুরীর গাড়ি চালায়। মাস মাইনে দুশ টাকা। তাও সব মাসে পায় না। অথচ ওর ঘাড়েই গোটা সংসার।

একটু আগেই একটা বেয়ারাকে করাপ্ট করে এক পাইট মাল ফ্রিতে আমরাই আদায় করেছি। তাহলে তপনের কি দোষ? আমরা নেশা করব। পকেটে টাকা থাকা সত্ত্বেও হোটেল মালিককে ঠকাচ্ছি। আর ও বুড়ো বাবা মা, বেকার সেজ ভাইকে খাইয়ে পরিয়ে রাখবে বলে ঈষৎ জোচ্চুরি করছিল। বেশ করছিল। ঠিক করছিল। পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ বিচারের আমরা কে?

রজনী এ কথা তোমায় আমি বলতে পারব না। মনে মনে বলি। প্রতিদিন, গত চার বছর ধরে, যে কথাগুলো আমার ভেতরে ক্রমাগত ঘুনপোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে, সেই কথাগুলিই। তুমি না জানতে চেয়েছিলে চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে কেন এই অসুখ আজ? আজ নয়, এর উৎপত্তি আজ থেকে চার বছর আগে। মনে পড়ে আমার সেজদার সেই বিখ্যাত উপন্যাসটি সবে তখন বাজারে বেরিয়েছে। দাদা নিজে এসেছিলেন উপহার দিতে। মলাট ওলটাতেই চোখে পড়ল উৎসর্গ পত্র—রজনীকে।

মুখে মুখে বললাম রজনী, ওই কেয়ার ঝাড় থেকে কেয়ার মিষ্টি গন্ধ কেমন ভেসে আসছে।

রজনী সপ্তমীর হালকা মরা জ্যোৎস্নায় ওর অসামান্য নিটোল গ্রীবা ডানদিকে ঈষৎ হেলিয়ে দিয়ে জানতে চাইল: কোন্‌টা কেয়াফুলের ঝাড় গো?

আমি এখন কি করি? মাতাল করা কেয়ার গন্ধ, জ্যোৎস্নায় প্রতিমার মত সুন্দরী এক রমণী টাওয়ারের এই রেলিংয়ের ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে স্বামীর কাঁধে হাত রেখে নির্ভরতা চাইছে। সমস্ত মুখ চোখ জুড়ে এখন শুধু স্নিগ্ধতা। কোথাও কোন মালিন্য নেই। কত অপরূপ এই রমণী? আমি কোন্ ছার, যে কোন পুরুষই এর প্রেমে পড়তে বাধ্য। সেজদাও তো

মালোপাড়ার জালে বন্দী সুন্দরবনের নদী-নালায়

তখন সুন্দরবন একেবারে চষে বেড়াচ্ছি। ইন্দিরাণী এমারজেনসি ঘোষণা করে খবরের কাগজের পাতায় রাজনীতির চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু শহরে মানুষজনের এত বছরের অভ্যেস যাবে কোথায়? সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই চা চাই, বাথরুমে যাওয়া চাই, বিড়ি সিগারেট চাই—আর চাই কাগজ। কিন্তু কোন্ কাগজ? কি খবর থাকবে সেই কাগজে? নিউজ এডিটর ডেকে বললেন, মাঝে মাঝে তোমার মুখে সুন্দরবনের গল্পো শুনি। যাও তো একবার ভাল করে ঘুরে দেখে শুনে কাঠুরে, মৌলি (যারা মধু সংগ্রহ করে), মাছ মারাদের ওপর রিপোরট দাও। যথা আজ্ঞা। বরের সঙ্গে নাপিত যে ধরণের ছোট একটা বাক্স নিয়ে যায়, ঠিক সেই মাপের একটা রং চটা চামড়ার সুটকেসে লুঙ্গি, গামছা আর কাগজ ও ডটপেন নিয়ে রওনা দিলাম। পঁচাত্তর সালের আগস্ট মাস। দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হতে চলেছে। বর্ষাভেজা সকালে ক্যানিং থেকে লঞ্চে চেপে রওনা দিলাম। যাব গোসাবা। ওখানে গোপীনাথ সেই আমার চেনা লোক। পেশায় ডাক্তার। স্থানীয় লোকেরা বলে বাঘবদ্যি। ত্রিশ বছরের ডাক্তারী জীবনে এই নোনা জল-জঙ্গলের দেশে পড়ে থেকে মানুষটি অন্ততঃ তিনশ বাঘেকাটা মানুষকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। গোসাবার একমাত্র এলোপ্যাথ। মানুষ তো নয় দেবতা। যখন যে ডাকে তার ডাকেই সাড়া দেয়। ফিজ দিতে পারো ভালো, না পারো কুছ-পরোয়া নেই। আগে তো সারাই। সোজা সেই মানুষটার বাড়ির দরজায় উঠে ধাক্কা দিয়ে বললাম: ডাক্তারবাবু এবার আমায় একটু সাহায্য করুন।

কি সাহায্য চাই তা শুনে বললেন: এই ব্যাপার। বেশ তো সামনেই কৃষ্ণপক্ষের দশমী। আমাদের মালোপাড়ার মাছমারাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যরা বেরোবে নদীনালায় মাছ ধরতে। আমি বলে দিচ্ছি ওদের। সঙ্গে নিয়ে যাবে। তবে বড় কষ্ট পাবেন।

হেসে বললেন : জেলেরা, যারা মাছমারে তাদের কষ্ট হয় না ?

জবাব দিলেন : ওরা অভ্যস্ত। যুগ যুগ ধরে, পুরুষানুক্রমে। আপনারা শহরে মানুষ। তা যখন সখ হয়েছে একবার ঘুরেই আসুন।

গোসাবার লাগায়ো গ্রাম আরামপুর। ওই গাঁয়ের মাছমারাদের কাছে ডাক্তারবাবুর আদেশ বেদবাক্যি। ওরা এক কথায় আমাকে সঙ্গী হিসাবে নিতে রাজি হয়ে গেলেন। নবমী নিশি পোহাতে না পোহাতে রওনা দিলাম। চললাম দেখতে সুন্দরবনের নদী নালা খাল কিভাবে মালোপাড়ার জালে বন্দী হয়।

সুন্দরবনে গরাণকাটি খালে কৃষ্ণপক্ষের দশমীতে যে জোয়ার এসেছিল, শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে তার অবসান। সেই সঙ্গে এবারের মত মাছ ধরার পালাও শেষ। চন্দ্রদোয়ানীর খাল ঘুরে হাপর বোঝাই মাছ নিয়ে সাঁইদার সুনীল মণ্ডল ও তার এগারো জন সঙ্গীর সঙ্গে আমিও ফিরব গোসাবায়। জোয়ার অনুকূল হলে অষ্টমীর রাতে পৌছাব নিশ্চিন্তে। ওই রাতেই চার নৌকোর দুই হাপরের সব মাছ এক হাপরে বোঝাই হয়ে চালান যাবে ক্যানিং-এর মেছোহাটায়। মাছ যেমন যেমন বিক্রি হবে, তেমন তেমন চালান আসবে ভোরের ট্রেনে কলকাতায়। শহরের মানুষ জানেন না প্রায় বিশ হাজার জেলে সমুদ্র বন নদী নালা খাল সব জাল ফেলে উথাল পাথাল করে দিচ্ছেন : চাই মাছ, বাবুরা খাবেন। বিনিময়ে মহাজনের ধার খানিকটা হবে শোধ, বৌ ছেলে মেয়ে দিন কয়েকের জন্য পান্তা ও গুড় পাবে খেতে, রাতে অন্ধকার কুঁড়েতে টেমির আলো ঘিরে ছেলে মেয়ের কাছে ডাকাতের গল্প, বাঘের গল্প বলবে সুনীল, প্রফুল্ল, দুলাল, অতুল, দীনবন্ধু, অনিল, পুলিন ও পরিতোষ বৈরাগীরা।

হাতঘড়ি যদি সময় ঠিক বলে, তাহলে এখন সকাল সাড়ে দশটা। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। থেমে থেমে সকাল থেকে। বংকা ও গরানকাটির মুখে বাঘমারা ব্লকের গায়ে বানী, কেওড়া, গরান গেঁউয়ার নির্জন জঙ্গলে সুনীলরা এখন ব্যস্ত ছাব্বিশ গজি জাল দিয়ে কুম ঘেরায়। ওই কুমেই আছে সবরকমের মাছ ভেটকি, ভোলা, পায়রাতালি, দাঁতনে, কানমাগুর। ছোট ছোট পায়রাতলির সঙ্গে রয়েছে তিন চার কিলোর ভেটকি ও ভোলা।

চার মাস আগে চৈত্র-বৈশাখে এই খালে কুম বেঁধে গিয়েছে ওরা। নদীর চড়ায় ভাটিতে জল নেমে গেলে জঙ্গলের বানী, গরান, গর্জন, খলসি ও গেঁউয়া গাছের ডাল ভেঙ্গে নরম পলিতে গেঁথে গেঁথে বসানো হয় ওই কুম।

ঠিক যেন বড় মাপের ছ সাত হাত গভীর একটা কুয়ো মাটির ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। গাছের ডালগুলি জঙ্গলের দড়ির চেয়েও শক্ত কেলে লতা দিয়ে বাঁধা। ওই চড়ার মাথা-জাগানো কূপ বা কুম জোয়ারের জলে ছাপাছাপি ভরে যায়। জলের সঙ্গে শ্যাওলা এসে জমে ওই কুমে। শ্যাওলা খেতে আসে ছোট ছোট মাছ। ছোটদের টানে এসে জোটে বড়রা। চার পাঁচ মাস ধরে চলে তাদের নির্বিঘ্ন গতায়াত। টেরই পায় না একদিন এই নিশ্চিত আশ্রয় জালে ফাঁদে ধরা পড়বে।

নৌকোর বুকে প্রায় বিনা তেলে অমৃত পাকাচ্ছে দুলাল। খালের জলে সুনীল, প্রফুল্ল, অতুল ও দীনবন্ধু। শেষ রাতে ভাটির সময় মাটি দিয়ে লেপাপোঁছা জলাটা কুমের চারধারে বেড় দিয়ে শুইয়ে রেখে এসেছে। ওটা ক্যামুফ্লেজ, মাছ টের পাবে না। তারপর জোয়ার যেমন যেমন বেড়েছে, তেমনি হিসাব করে করে জালটা তুলে ধরেছে। এখন জোয়ার শেষ হওয়ার মুখে। কুম জলে ও মাছে বোঝাই। ঘিরে রয়েছে জলে। নৌকোয় দাঁড়িয়ে একটি একটি করে গাছের ডাল ওই কুম থেকে তুলে নিচ্ছে জেলেরা।

আধ ঘণ্টা বাদে। বৃষ্টি নেমেছে। ভাঁটা শুরু হয়ে গিয়েছে। ডালপালা সব তোলা সারা। জালের মুখ জলের ওপর গোল হয়ে রয়েছে। দীনবন্ধু ডুব দিয়ে তলায় নেমে গেল। ভুস করে ভেসে উঠল মিনিট খানেক বাদে। হাতে জালের দড়ি। পাজামার দড়ির মত জালের তলায় ঘের। ওই দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। নিচে মাটির কাছে জালের মুখটা আস্তে আস্তে সরু হতে হতে এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুনীলের মুখ। বন্ধ জালে ধরা পড়া মাছগুলির দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল : প্রায় পনেরো কিলো হবে মনে হতিসে বাবু, কপালডা ভাল।

অতুল নৌকায় বাঁধা হাপরটা টেনে নিয়ে এল জলের কাছে। কলকাতায় পাতাল ড্রেনের জন্য যেমন বড় বড় কংক্রিটের পাইপ রাস্তায় পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি দেখতে এক একটা হাপর। বাঁশের চেঁচারি দিয়ে তৈরি। দুটি মুখই বন্ধ। ওপরে একটা ছোট জানলা। ওই জানলার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে মাছগুলো ভেতরে ফেলতে লাগল ওরা। জলে ডোবানো এই হাপরই ওদের বরফ বাক্স বা ফ্রিজ। দশ বারো দিন কাটে জলে। বিক্রি-বাটা হবে ক্যানিং-এর হাটে। জলের মাছ বন্দী অবস্থায় হাপরের ভেতরে খালে নদীর জলে ঘোরে ফেরে। এই নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা জলে আমরা তেরোটি মানুষ। নৌকার জল ছেঁচার শব্দ, হনুমানের হুপহাপ, হাপরে মাছের ছট-ফটানি।

নবমীর শেষ রাতে গোসাবা থেকে নৌকা ছেড়ে ছিল। সংখ্যা শ খানেক হবে। সাতজেলিয়া রাঙাবেলিয়া, গোসাবা, আরাম-পুরের রাজবংশী ও মালোদের ঘরে ঘরে যত জোয়ান পুরুষ ছিল, সবাই তখন নৌকায়। নৌকাপিছু তিনজন। চার নৌকায় একদল, দুই হাপর ও এক সাঁইদার। ওইদিন সন্ধ্যাবেলা আরামপুরে সুনীল, পরিতোষদের বনবিবিতলার ধারে ছিল একটি শোকসভা। গত কোটালে ওদের দলের অজিত মণ্ডলকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে। অজিতের বিধবা বৌকে ওই সভায় দুশটি টাকা ওরা দিল।

নৌকোয় তুলে দিতে এসে সুনীলের দাদা প্রাক্তন সাঁইদার সখিচরণ বললে, আগে হলি পরিবারটা ভেসে যেত বাবু। দু সন হল আমরা একটা কো-অপাটিভ (কো-অপারেটিভ সোসাইটি) গড়িসি। তারই টাকা থেকে ওরে দেলাম। কচি বৌটার কোলে অজিতেরই এক বছরের শিশুপুত্র।

কেন সমিতি গড়ল সখিচরণ, শিশুপদরা দুজনেরই বয়স হয়েছে। পঞ্চাশের ওপর। এখন আর মাছ ধরতে যান না। কম করেও ত্রিশ বছরের সাঁইদারি অভিজ্ঞতা ওদের এক এক জনের। দেশ ছিল খুলনা জেলায়। ১৩৫৬ সনে ঘরদোর ছেড়ে এক কাপড়ে ছেলে বৌ নিয়ে নৌকায় ভেসে চলে আসে এ পাড়ে। তখন গোসাবা মোল্লাখালির দক্ষিণে কোথাও ছিল না মানুষের বাস। এরাই গড়ে তুলেছে নিজেদের আশ্রয়।

গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে ক্যানিং-এর মহাজনদের টাকায় এরা কারবার চালিয়ে এসেছে। একশ টাকায় একদিনের সুদ এক টাকা। জাল-নৌকা সব বন্ধক। মাছ যা ধরেছে সিকি দামে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে মহাজনের ঘরে।

শিশুপদর চোখে পুরু লেনসের চশমা। গরানের মরা ডালের চেয়েও কালো মুখে কোথাও কোন অভিব্যক্তি নেই। ঘরে খাওয়ার মুখ বলতে পাঁচটি মেয়ে, বৌ রেণুকাবালা আর নিজে। ছিল ছ' ভাই। ওরা সবাই এখন পৃথক। এক এক ঘরে এক এক দিন পেটভরে অন্ন দিতে লাগে কম করেও তিন থেকে চার কিলো চাল। হাজার হাজার টাকার মাছ ধরেও কোনদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পায়নি। তখন স্থানীয় এম পি, হ্যামিলটন এসটেটের বর্মন ডাক্তারবাবু, মণি মজুমদার, বাসুদেব বিশ্বাসের পরামর্শে ওরা ১৩৮০ সনে এই সমিতি গড়ে। সাতজোলয়া, রাঙাবেলিয়া, গোসবা ও আরামপুরের ২৭১ জন জেলে কাগজে কলমে এই সমিতির সদস্য। অথচ নৌকা যখন ভাসল তখন দেখলাম সমিতির মোটে আটচল্লিজন রয়েছে দলে। কেন?

দুর্গাদোয়ানীর খাল, ঝিলা, বিদ্যা নদী পার হয়ে রায়মঙ্গলের পাড় ঘেঁষে

চলতে সাঁইদার সুনীলের মুখেই পেলাম ওই কেন'র জবাব। এখনো যে দানা বেঁধে ওঠেনি বাবু। ছই-এর বাইরে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি, জল ছেঁচছে অতুল, পুলিনরা। গত সনে (গত জুলাই থেকে এবারের জুন) ওরা সবসুদ্ধ বারো বার কুমঘেরা করেছে। তাতে মাছ ওঠে প্রায় পঁচাশি কুইন্টাল। দাম তেত্রিশ হাজার টাকা। আষাঢ় থেকে কার্তিকের মাঝামাঝি চলে কুমঘেরা।

তারপর শুরু হয় বেঁউতি। বড় নদীতে কাঠের পিপেতে বড় জাল পেতে ধরে চাপড়া, আলতা, বাউটা নানা জাতের চিংড়ি। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুনের শেষ অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মারচ, এই চার মাসে আট খেপে বেঁউতি অপারেশনে ওদের মাছ উঠেছে পঞ্চাশ হাজার টাকার। চারশ ত্রেত্রিশ কুইন্টাল। এপ্রিল ও মে, গরমের দুই মাস নদী ও খালের মুখে জাল আটকে চলেছে ওদের খাল-পাটার কাজ। তিন খেপে ওই দুই মাসে ধরেছে ওরা চিংড়ি, ভেটকি, ভাঙন, পাঙাস, ভোলা, ফ্যাসা ইত্যাদি নানা ধরনের মাছ সবসুদ্ধ প্রায় এগারো কুইন্টাল। দাম পেয়েছে প্রায় পৌনে চার হাজার টাকা।

মোট তেইশ খেপে মাছ ধরে ওদের আয় হয়েছে সাতাশি হাজার টাকা। কিন্তু এর মধ্যে ছাব্বিশ হাজার টাকা গেছে ব্যাঙ্কের দেনা মেটাতে। ইউকো ব্যাঙ্কের টাকাতেই সমিতির চলন শুরু। গত বছর ব্যাঙ্ক নৌকা, জাল, কাঠের পিপে ইত্যাদি বানানোর জন্য ধার দিয়েছিল পঁচাত্তর হাজার টাকা।

সমিতির সদস্যদের মাস মাইনে সত্তর টাকা। এ ছাড়া প্রতি কোটালে চাল, ডাল, নুন, তেল, মশলা বাবদ সদস্য পিছু খরচ আরো প্রায় পঁচাত্তর টাকা। সব দিয়ে থুয়ে খরচ খরচা মিটিয়ে এখনো সমিতি শক্ত জমিতে দাঁড়াতে পারে নি। সদস্যদের আর মহাজনের খাতক জেলেদের চেয়ে একতিলও ভাল নয়। তাই খাতায় নাম লিখিয়েও অধিকাংশই স্বতন্ত্র ভাবে মাছ ধরা কারবারে ব্যস্ত।

এবারই সমিতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত। পারেনি তার কারণ সুনীল, অতুলদের মতে একটাই—ডাকাতি। গত সনে সাত খেপে ডাকাতি হয়েছে। প্রায় ছেচল্লিশ হাজার টাকার মাছ, নৌকা, জাল ও জেলেদের চাল ডাল গিয়েছে লুট হয়ে।

ডাকাতরা নৌকা করে আসে। হাতে স্টেনগান, ব্রেনগান, লাইট মেশিনগান। এরা আসে নদীপথে। পথ দেখায় স্থানীয় এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের ঘরে আছে পর্যাপ্ত ধান চাল আর লাইসেনসড বন্দুক।

হরিণভাঙা নদী ছেড়ে ভরকুণ্ডা খালের মুখে ঢোকবার সময় সুনীল বলল,

গত কোটালে এই খালেই বাবু সর্বস্বান্ত হয়েছি। অনিলরা গোটা কোটাল নিরুপদ্রবে মাছ ধরল তাই তাদের প্রতিদিন মাছ উঠেছে গড়ে সাড়ে সতেরো কিলো। সেখানে নৌকা, জাক, হাপর ও রেশম খুইয়ে প্রায় খালি হাতে ফিরে এসেছি—দিনে সাড়ে তিন কিলোর মত মাছ ধরতে পেরেছি। একই হাল পুলিনের। তাই ওর দলের নিত্যকার গড় পরিমাণ মাত্র ছ' কিলো।

বাঘকে ওরা ভয় পায় না। জঙ্গলেই কাটে সারাজীবন। যাওয়ার আগে ব্যাঘ্র-বাহিনী সিঁদুররাঙা বনবিবির কাছে বাতাসা ও ফুলের অর্ঘ দিয়ে যায়। কিন্তু ডাকাত? নিরাশ্রয় জাল-সম্বল এই মানুষগুলি কি করে পারবে ওই ডাকাতদের সঙ্গে? সুনীল, সখীচরণ. শিশুপদরা একটা তালিকা দিয়েছে আমাকে, কোথায় কোথায় ডাকাতি হয়—বারটুস খাল, কাটুয়াঝোড়ি, ছোট হরিখালি, বড় হরিখালি, উত্তর চড়া, দক্ষিণ চড়া, ছায়াকাপুরা, বুড়ির ডাবরি খাল, হলদি খাল, চন্দ্রমুখানি, পঞ্চমুখানি, দত্তকসুর, হানাখালি ও চন্দ্রদোয়ানী খাল। সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র।

কৃম খালি হয়ে গেল। হাপরে সব মাছ তোলা সারা। সুনীল, অতুল, পুলিনদের সর্বাঙ্গে নোনা জল আর মাটি। লাখ লাখ বিড়ি পোকা ছেঁকে ধরেছে ওদের। কামড়ে বড় যন্ত্রণা। বৃষ্টি ধোয়া নীল আকাশের নীচে নদীর ঘোলা জলে তাড়াতাড়ি গায়ের ময়লা ধুতে ওরা ব্যস্ত। এরপর পনেরো দিনের বরাদ্দ মাথা পিছু দুশ গ্রাম সরষের তেলের প্রায় খালি শিশিটা হাতের চেটোয় একবার ছুঁইয়েই সারা গায়ে ডলতে শুরু করবে। এটা নাকি তেল মাখা—তেল বিড়ি পোকার যম। দুলালের রান্নার কাজও শেষ। সানকিতে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। সেই সঙ্গে প্রায় কিলোটাক মশলাহীন মাছের ঝোল। কেওড়া ফল দিয়ে পাকানো মাছের অম্বল। আর ঘর থেকে আনা নিম পাতা দিয়ে মাখানো মাছের সুক্তো। চার ধারে শুধু মাছের তীব্র আঁশটে গন্ধ। বুক ভরা ভয়—বাঘের। নদীর পাড়ে অজস্র কাঁকড়া, জঙ্গলে নাম না জানা পোকাদের রব। এই পরিবেশে এই ভাত খেতে বড় ভাল লাগে।

তিনটি নিহত বাঘের সন্ধানে

মাছমারাদের রিপোর্ট না হয় হল। কিন্তু সুন্দরবনের গহীন জঙ্গলে যারা বাঘ মারে, হরিণ মারে—তাদের খবর কোথায়? নিউজ এডিটরের গম্ভীর মুখের কঠিন প্রশ্ন।

বললাম—তাহলে আর এক রাউণ্ড ঘুরে আসি।

উত্তর হল : তাই এসো। সেই সঙ্গে নিয়ে এসো টাটকা খবর।

বেরিয়ে তো পড়লাম। কিন্তু বাঘ মারার টাটকা খবর জোটানো কি চাট্টিখানি কথা। এ কি থলি নিয়ে বাজারে গেলাম আর আলু পটল মাছ কিনে আনলাম। থাকগে এখন তো আর ফেরার কোন উপায় নেই। যে করেই হোক খবর আনতেই হবে। তাই আবার ক্যানিং, আবার সেই গোসাবা। পঁচাত্তরের সেই আগস্ট মাস। তখন টাইগর প্রজেক্টের হেড কোয়ার্টার ওই গোসাবা। আর ওই হেড কোয়ার্টারের হেড্ হলেন ডিরেক্টর কল্যাণ চক্রবর্ত্তী। আড়ালে প্রজেক্টের লোকজন যাকে বলে বাঘ চক্কোত্তি।

কপাল নেহাতই ভাল। মাস শেষ হয়ে এসেছে। শুনেছিলাম বাঘ চক্কোত্তি নাকি মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় সে দফতরের সব বড় কর্তারা থাকেন। তাদের কাছে রিপোর্ট পেস, নির্দেশ নেন। এবার কি কারণে যেন থেকে গিয়েছেন; তাই গিয়েই পেয়ে গেলাম। হ্যামিলটন এসটেটের গোসাবায় তেতলা বাড়ির তেতলায় প্রজেক্ট টাইগারের অফিস। অফিসের গায়েই একটা ছোটঘর। ডিরেক্টরের বেডরুম কাম ডাইনিং রুম। লুঙ্গির ওপর একটা হাতকাটা গেঞ্জি চড়িয়ে বাঘের ওপর লেখা একটা ইংরাজি বই পড়ছিলেন। আমায় দেখে খুশী হলেন। বড নিঃসঙ্গ মানুষ। বললেন : খুব ভাল হল। চলুন কালই আমরা প্রজেক্ট এরিয়ায় বেরোবো। যাতা খবর সব আসছে। একবার যাচাই করে দেখা দরকার। আর এবার যাত্রাসঙ্গী হিসাবে পাবো বসিরহাটের এস ডি পি ও সন্ধি মুখার্জিকে। বয়স সাতাশ আটাশ হবে, কিন্তু খুব জবরদস্ত লোক।

বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী যে কোন বন্য প্রাণী খুন করলে চূড়ান্ত শাস্তি ছ মাস জেল ও দু হাজার টাকা জরিমানা। আইন করেছেন ইন্দিরাজী। কল্যাণবাবু নিত্য নতুন খবর পাচ্ছেন। কিন্তু অপরাধীদের সন্ধান মিলছে না। বাঘ মরছে চামড়ার জন্য, হরিণও মরছে একই কারণে—সেই সঙ্গে হরিণের মাংস। আর এই বৈরিতার সূত্র সন্ধানে এবারের যাত্রায় হলাম বাঘ চক্কোত্তির সঙ্গী।

প্রজেক্ট টাইগারের ডিরেক্টর কল্যাণ চক্রবর্ত্তী ও আমার সঙ্গে বসিরহাটের এস ডি পি ও সন্ধি মুখার্জির দেখা হল বাগনা ফরেস্ট রেভিনিউ চেকপোস্টে। সামনে ঝিল নদী জোয়ারে তখন ফুঁসছে। পেছনে রায়মঙ্গল ও বিদ্যা সমুদ্রের মতন দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে। সামান্য কয়েকটি জেলে নৌকা চেকপোস্টের ধারে

খুটির গায়ে লেপটে থর থর করে কাঁপছে। সকাল নটা হবে। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বেশ এক পশলা। জেলেরা, কাঠুরেরা এবং চৈত্র-বৈশাখে মৌলিরা মাছ, কাঠ ও মধুর সন্ধানে বনে ঢোকার আগে এই চেকপোস্টে এসে পারমিট করিয়ে নেন—জঙ্গলের ছাড়পত্র।

কল্যাণবাবু দিন কয়েক আগে খবর পান, মাস পাঁচেক আগে নাকি একদল স্থানীয় শিকারী ঝিলার জঙ্গলে একটি বাঘ শিকার করেছে। জল জঙ্গলের দেশ সুন্দরবনে খবর এমনিতেই একটু দেরিতে পৌঁছোয়।

চেকপোসটের খাতাপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কল্যাণবাবু দুম করে প্রশ্ন করে বসলেন: আমি জানি বাঘ-মারা হয়েছে ওই ঝিলার জঙ্গলে। আপনারা যা জানেন বলুন। ডিরেক্টর সাহেবের আচমকা প্রশ্নে চেকপোস্টের ফরেস্টার, পেট্রোল অফিসার ও রেভিনিউ অফিসার তিনজনেই যেন চমকে উঠলেন। পেট্রোল অফিসার ও রেভিনিউ অফিসার সরাসরি বললেন, এ রকম কোন খবর তাদের জানা নেই। তখন ফরেস্টার বাসুদেব সিং সর্দার খানিকটা ইতস্তত করে বললেন: স্যার বাঘ মারা গেছে কিনা জানি না, তবে নবমীর (পয়লা আগস্ট) রাত্রিতে ওই জঙ্গলে কুমিরমারির একজনকে বাঘে ধরেছে। সে এখন মোল্লাখালির হেলথ সেণ্টারে।

পাঁচ মাসের বাসী ঘটনার জায়গায় পঁচিশ দিনের টাটকা ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণবাবু ও সন্ধিবাবু দুজনেই মনে হল রীতিমত বিস্মিত। শুরু হল জেরা। ফরেস্টার নিজেও সব ঘটনা জানেন না। জানেন ওই বনেরই দুই ওয়াচার। শচীন কয়াল ও অধীর মণ্ডল। বিশ-বাইশ বছরের দুটি ছেলে। পরনে বন দফতরের ইউনিফরম খাকি হাফ প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট। খালি হাতে একশ কুড়ি টাকার বিনিময়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে শিকারীদের হাতে বাঘ বা হরিণ মারা পড়ল কিনা, সেই সন্ধান করে বেড়ানোই তাদের কাজ। তারাই খবর এনেছে। ডাক পড়ল তাঁদের। আর তখনই জানা গেল।

প্রথম ঘটনাটিতে হরিণ শিকার করতে গিয়ে শিকারীদের একজন বাঘের মুখে পড়ে। বাঁচতে গিয়ে চালায় বন্দুক। নির্ভুল তাক। পরের দিন সকালে গিয়ে ওর চামড়াটি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঠিক এক মাস আগের। অধীর বলতে লাগল। পাঁচ জুলাই। সারাদিন ওই ঝিলা ব্লকের সরকারী নারকেল-বাগান ও গরান জঙ্গলে পাহারা দিয়ে সন্ধ্যার মুখে ঘরে ফিরছিল। বাগান যেখানে শেষ ও জঙ্গলের শুরু ঠিক সেইখানে আলের ওপর পা দিয়েই ওরা চমকে উঠল। দশ ফুট নীচুতে নরম মাটির ওপর পড়ে

রয়েছে সন্থ ছাল ছাড়ানো একটা বাঘের দেহ। মুণ্ডু থাবা সব কাটা। ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আল ধরে পালিয়ে আসবে বলে ছুটতে গিয়েই ওরা থমকে দাঁড়াল। সামনে বন্দুক উঁচিয়ে খোদ শিকারী। সঙ্গে তার আরো তিন সঙ্গী।

বাবু বন্দুক দেখিয়ে আমাদের বলল, কাঁদতে কাঁদতে অধীর বলে চলে, যদি কেউ জানতে পারে একদম নিকেশ করে দেবে। তারপর শিকারীর নির্দেশে দুই সরকারী ওয়াচার অধীর ও শচীন এবং শিকারীর দুই অনুচর ধরাধরি করে ছাল ছাড়ানো 'জঙ্গলের ভদ্রলোকের' দেহটিকে ফেলে দিয়ে এল গরান জঙ্গলের ভেতরে।

অধীর ও শচীনের ধারণা শিকারীর উল্টো দিকের কুমীরমারি গ্রামের বাসিন্দা। সারাদিন ধরে কুমিরমারি গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুলিশ ধরল অভিযুক্তদের কয়েকজনকে। বিকেলে স্পিড বোট গিয়ে ভিড়ল ঝিলা ব্লকের সরকারী নারকেল-বাগানের জেটি ঘাটে। ঘাট বলতে সরু সরু গরান কাঠ কয়েকটা রশি দিয়ে বাঁধা। তখন ভাঁটা চলছে। ওপরে জমি ভিজে। জোয়ারের জল নেমে গিয়েছে। নরম আল ধরে আমর চলেছি—বাঘের কঙ্কালের সন্ধানে।

দু' ধারে লুপ্ত গরান জঙ্গলের পরিত্যক্ত ভূমিতে নতুন করে নারকেল ও ঝাউ গাছের চারা পোঁতা হয়েছে। এক সঙ্গে আড়াই হাজার বিঘা। দূরে প্রায় দিগন্তের কোল ঘেঁষে গরান্ ও গেঁউয়ার জঙ্গলের মাথায় তখন সূর্য। শচীন আমাকে পেছন থেকে হাত ধরে টেনে ধরল। তারপর সামনে এগিয়ে এসে ছাতার ঝিক দিয়ে কি যেন একটা জিনিস সরিয়ে দিল আলের ধারে। তাকিয়ে দেখি দেড় ফুট লম্বা একটা সাপ। ফিক করে হেসে বলল শচীন মেটে সাপ বাবু, কাউকে কাটে না।

ঝিলা একটি দ্বীপ। রীতিমত বড় সাইজের। কোন মানুষ এখানে থাকে না। আগে তবু কাঠুরেরা আসত গাছ কাটতে। সম্প্রতি তাও হয়েছে নিষিদ্ধ। ওই নির্জন দ্বীপে শচীনদের মত জনা দশেক ছেলে নিত্য পাহারা দিয়ে ফেরে। ক্যানেস্তারা পিটোয়। হাততালি দেয় মন থেকে বাঘের ভয় ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু ঝেড়ে যখন ফেলতে পারে না, তখন মাঝে মধ্যে ওই বাগান ও জঙ্গলের ভেতরে বড় বড় কেওড়া বা পশুর গাছের ডালে কাঠকুটো ডালপালা দিয়ে বাধা মাচানে গিয়ে উঠে বসে। এই শিকারীরা আসে প্রায়ই। স্থানীয় গায়ের অবস্থাপন্ন মানুষজন সব। ঘরে ঘরে বন্দুক। একটা হরিণ মারলে

আয় আটশ টাকা। ষাট কিলো মাংস। গাঁয়েই মাংসের দর দশ টাকা কিলো। ছালের দাম আরো দুশ। আর বাঘের চামড়ার দাম কলকাতায় কম করেও তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। 'এই দেখুন বাবু বাঘের পায়ের ছাপ।'

লাফ দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া আলের ফাটলটা পেরিয়ে গেলাম। পেছনে নীচের একটা ছোট ডোবার দিকে আঙুল নির্দেশ করে দাঁড়িয়ে অধীর। বলল, একেবারে টাটকা। তিন চারটে জোয়ারেরও দাগ মিলয়নি। এরপর ওই আলের পথে আরো চার-পাঁচবার দেখা মিলল বাঘের পায়ের ছাপের। দুটি হরিণের ক্ষুরের দাগও দেখলাম। কল্যাণবাবু বললেন, এই বনে বাঘ রয়েছে। তাঁর হিসাব একটি বাঘিনী ও একটি বাচ্চা বাঘ ঘুরছে। এই হিসাব যখন পেলাম, তখন প্রায় দেড় মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি, আরো বাকি প্রায় এক মাইল। খালি পা দুটো নরম মাটি মেখে যেন দুরমুষে পরিণত হয়েছে। আর তখনই কানে এল সন্ধিবাবুর গলা, তাড়াতাড়ি পা চালান। সঙ্গে টর্চ নেই, তাড়াতাড়ির মাথায় আনতে ভুলে গেছি।

আমরা নারকেল বাগানের শেষ মাথায় এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন সূর্য গরান জঙ্গলের সবুজ পাতার ওপর থেকে বৃষ্টির জল মুছে নিচ্ছে।

ফরেস্টার বাসুদেব সিং একটা অতীত অভিযানের কথা বলতে সবে শুরু করেছিলেন, ডিরেক্টর সাহেব তাড়া দিয়ে উঠলেন : গল্প টল্প পরে হবে। আগে কঙ্কালটা খুঁজুন। শচীন ও অধীর আল থেকে নেমে নীচের নরম মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। অজস্র ছোট ছোট কাঁকড়া, নাম না জানা পোকা-মাকড় চারিদিকে ছড়ানো গরানের কালো ডালপালার ভেতরে ভেতরে ঘুরছে। শচীন একটা ছোট গাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড় বিড় করে যেন বকছে। একটু বাদে উঠে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ ঘুরে ফিরে হাততালি দিল বার কয়েক। অধীর দেখলাম হাততালি দিচ্ছে। সঙ্গে আমরাও। কল্যাণবাবু কানে কানে বললেন, বনবিবির পুজো সেরে ওরা বনের বাঘকে বন্দী করে ফেলেছে।

সরু ডালপালার রাশ মাড়িয়ে মাড়িয়ে শচীন ও অধীরদের পেছন পেছন ঢুকলাম গরান জঙ্গলে। বাইরে তখনো সূর্যের শেষ আলো, অথচ জঙ্গলের ভেতরে সন্ধ্যা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দশ, বারো ফুট লম্বা এক একটা গরান গাছ। ব্যবধান বড় জোর এক ফুট কি দেড় ফুট। ডালপালায় এক মানুষ দূরেই দৃষ্টি আটকে যায়। শচীন, অধীর, কল্যাণবাবু সন্ধিবাবু, বাসুদেব সিং সবাই মাটিতে উবু হয়ে হাঁটকাচ্ছে। প্রথম উঠে দাঁড়াল অধীর। কল্যাণবাবুর দিকে একটা বড় হাড় এগিয়ে দিয়ে বলল' বাবু মনে হতিসে এটা পায়ের। তারপর একে

একে পাঁজরের, শিরদাঁড়ার, হাঁটুর অনেকগুলি টুকরো টুকরো হাড় পাওয়া গেল। শচীন তার গামছায় কোচড়ভরে বেঁধে নিল হাড়গুলি। মিনিট দশেক বাদে কল্যাণবাবু নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আর নয়, এবার চলুন। আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মৃতদেহটাকে অন্য বাঘেই খেয়ে গিয়েছে। এই কটা হাড়ের টুকরোই ওর অবশেষ।

ফিরতি পথে অন্ধকার নারকেলবাগানে আল পথ দিয়ে সবাই ফিরছি। সবার আগে শচীন। ওর গামছায় নিহত বাঘের অবশিষ্ট কয়েকটি অস্থি। সবাই কেমন গুম মেরে গিয়েছে। কানে এল কল্যাণবাবু এস ডি পি ও সন্ধি বাবুকে বলছেন: পাঁচ মাসে এরা তিন তিনটে বাঘ মেরে ফেলল। এভাবে চললে পরের বছরেই গোটা সুন্দরবন সাফ হয়ে যাবে—যেমন সুন্দরী গাছ গিয়েছে তেমনি বাঘও যাবে শেষ হয়ে।

[বাঘ সব সাফ হবে কি না জানিনা, ফিরতে পথে এখন নিজেরই গা ছম ছম করছে বাচ্চা সমেত একটা বাঘিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জঙ্গলে। ওরা তো জানে না, কে শত্রু, কে মিত্র। বহু দূর থেকে নদীর আওয়াজ ভেসে আসছে। আর ঘণ্টাখানেক বাদেই এই দ্বীপটা তলিয়ে যাবে জোয়ারের জলের তলে। তার আগেই ঘাটে পৌঁছোনো দরকার। বড় জোর এক মানুষ হাঁটতে পারে এমনি সরু আলপথ। জলে ভিজে মাটি একেবারে সড়সড়ে হয়ে আছে। একবার পা পিছলোলে আর দেখতে হবে না—সোজা হাত আটেক নীচে নারকেল ও ঝাউ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে গরাণ গেঁউয়ার এক দেড় হাত উঁচু বল্লমের মত শূলোয় গেঁথে যেতে হবে। টর্চ নেই, লণ্ঠন নেই। থাকার মধ্যে বাসুদের সিং সরদারের হাতে একটা গাদা বন্দুক। বুলেট ভিজে ঢোল। তাই বাটের মুখটা ধনুকের মত বেঁকে। ট্রিগার টেপাও যা না টেপাও তাই। বড় জোর ওটাকে একটি লাঠির মত ব্যবহার করা যায়। বাঘের ভয় মনের ভেতরে তালশাঁসের মত দানা বেঁধে উঠেছে।

আলপথ ধরে আমরা কয়েকজন পা টিপে টিপে এগোচ্ছি। শক্ত মানুষ বাঘ চক্কোত্তি। পুলিশ সাহেব সন্ধিবাবু। সবাই নীরব। হঠাৎ একটা চাপা কান্না কানে এল। কে কাঁদে? ঘুরে দাঁড়ালাম। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি সেই চৌকো সাইজের মস্ত মানুষটি রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন আর বলছেন—জঙ্গল কেউ ভালোবাসে না, সবাই মারতে চায়। সেই মুহূর্তেই চিনতে পারলাম মানুষটাকে। সবাই ভয় পায় বাঘকে, ভালবাসে শুধু একজন। নাম তার বাঘ চক্কোত্তি।

বাঘ চক্কোত্তির সংসার

বিশাল একখানা ছাতা আকাশ থেকে ঝুলছে। সন্ধ্যার বাকি নেই বিশেষ, বাতাস প্রচণ্ড। দুর্গাদোয়ানি খালের বাঁধ ধরে আমরা কজন হাঁটছি। সামনে পিছনে আরামপুরের জেলেদের সাঁইদার শিশুপদ ও তার সঙ্গী সুনীল, সখীচরণ, অখিল, অনিল মাঝখানে স্থানীয় ডাক্তার গোপীনাথ বর্মণ, দুই মণি মজুমদার ও বাসুদেব বিশ্বাস আর আমি। কলকাতার বাঁধানো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এমন বদ-অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে মাটি বাঁধের এবড়ো খেবড়ো সরু পথে পা চলে না, স্যাণ্ডেল খুলে আসে। বর্ষায় মাটি ভিজে কোথাও দলদলে, কোথাও ভয়ঙ্কর পেছল। সর্বদাই ভয় এই বুঝি পা পিছলে আল থেকে পড়ি। শিশুপদ হাতে একটা হ্যাজাক, ডাক্তার বর্মণের হাতে চার ব্যাটারীর একখানা টরচ। গম্ভীর ব্যাজার মুখে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ডানদিকে নদী টেস্ট ম্যাচের রনজি স্টেডিয়ামের মত ভর-ভরতি, বাঁদিকে বাজার, থানার পরিত্যক্ত চালকলের পোড়ো ভিটে, হ্যামিণ্টনের ছোট বাংলো পর পর পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গন্তব্যস্থল আরামপুরের একটি শোকসভা।

গোসাবার পাশের গাঁ আরামপুরের অজিত মণ্ডলকে বাঘে খেয়েছে। চব্বিশ বছরের জোয়ান, ঘরে ষোড়শী বৌ, এক বছরের বাচ্চা একটা ছেলে ও ষাট বছরের বুড়ো বাপ মানিককে রেখে নদী ধরে জঙ্গলে নেমে গিয়েছিল ঘর-খোরাকির চাল-ডালের মাশুল জোটানোর জন্য মাছ মারতে। গোসাবা নদীর ধারে বাঘের আড়ৎ চামটা দ্বীপের আট নম্বর ব্লকে ভোর ভোর নৌকো থেকে নেমে বুনো কেলে লতা কাটছিল। নদীর চরে মাছ ধরার, কুম বা কুয়ো বানাতে ডালপালা বাঁধার জন্য দড়ির অভাবে ওই লতা সুন্দরবনের জেলেরা ব্যবহার করেন।

দক্ষিণে প্রায় সমুদ্রের কাছে ওই চামটা দ্বীপ। বঙ্গোপসাগর আর চামটার মাঝখানে পড়ে আর একটি মাত্র দ্বীপ : গোমা। গোসাবা থেকে চামটা লঞ্চে পড়ে প্রায় আট থেকে দশ ঘন্টা, নৌকায়, ভাঁটির টানে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা। গোসাবা নদীর পাড়ে চামটা—লঞ্চ

থেকে মনে হয় যেন পুরু গাঢ় সবুজে আপাদমস্তকে মোড়া বিশাল একখানা থালা। চারদিক ঘিরে ঘোলা অবিরল জলস্রোত। পাড়ে জল ঘেঁষে নরম পলিমাটিতে উঁচু হয়ে আছে লক্ষ লক্ষ শুলো। তারপর জলজ ঘাস। ঘাসের পর একরাশ কোঁকড়া চুলের মত বাইশ গাছের ঝোঁপ। ওই ঝোঁপ শেষ হতে না হতেই গরান ও গেঁউয়ার জঙ্গল। বেশি পুরোনো নয় এসব দ্বীপ। হয়তো কয়েক শ' বছর আগে নদীর বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ময়দার তালের মত নরম মাটি কেটে জলধারা অসংখ্যক খাড়ি রচনা করে ভেতরে ভেতরে বহু গভীরে নেমে গিয়েছে। মাছ ধরার ছোট ডিঙি ছাড়া আর কিছু ওই সব খাড়ি খুড়ি খালপথে ঢুকতে পারে না।

হাঁটতে হাঁটতে অজিতের শেষ দিনটির কথা শুনছিলাম সাঁইদার শিশুপদ মণ্ডলের কাছে, মাঝারি সাইজের একখানা সলিড পাথরের মত গড়ন শিশুপদ। টেলিফোনের মত গায়ের রং বিরল কেশ, চোখে চশমা, পরনে লুঙ্গির উপর একটা হাফসার্ট—হাফ ফতুয়া। বয়স বাহান্ন কি তিপান্ন। জাতে রাজবংশী, শিশুপদরা দুই ভাই। দেশ ছিল বাংলাদেশে কপোতাক্ষী নদের ধারে আসাশুনি থানায় খাজরা গ্রামে। দেশ বিভাগের দু বছর পর অতিষ্ঠ হয়ে এক কাপড়ে ছোট ছোট পাঁচ ভাই এবং বাবা বাণীকান্ত ও মা নারায়ণীকে নিয়ে নৌকায় পালিয়ে আসে এই বাংলায়। বঙ্গোপসাগরের পাড় ঘেঁষে, সমুদ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর হরিণডাঙ্গার দোতলা তেতলা ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছ' সাত দিন বাদে এসে ওরা হাজির হয় গোসাবার কাছে মসজিদবাটীতে। সেদিন ওদের মত আরো প্রায় এক হাজার জেলে পরিবার একইভাবে পালিয়ে এসে সুন্দরবনে আশ্রয় নিয়েছিল। অজিতের বাবা মানিক মণ্ডলও এসেছিলেন, অজিত তখনো হয় নি।

আরামপুরে আরামে থাকবি

শিশুপদর মুখে শোনা : তখন এদিক বাহ জনমানব শূন্য। লোক বলতি গোসাবায়, সাডনেলিয়ায় আর রাঙাবেলিয়ায় কয়েক ঘর মাত্র। তা বছর কয়েক এধার ওধার ঘুরে কোথাও থিতু হতি না পেরে চলি এলাম এই আরামপুরে। আমাদের নিয়ে এলেন ডাক্তারবাবু। রোগভোগ হলি আমরা ছুটে আসতাম ডাক্তারবাবুর কাছে। মসজিদবাটীতে গিয়ে রোগী দেখবার জন্য ওর ফি তখন

দশ টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিতেন আট টাকা। উনিই বললেন গোসাবায় আয়, আরামপুরে আরামেই থাকবি। তা তখন গোসাবার মণ্ডল কংগ্রেসের ছেকরেটারি ছিলেন শরৎ নাথ, উনি জমি জায়গায় সব ব্যবস্থা করি দিলেন। আমরা ছ' সাত শ ঘর চলি এলাম। এসব বিশ বাইশ বছর পূর্বের কথা। তখন মানিকের ছেলে অজিত সবে হয়েছে।

তখন একটা নৌকার ভাড়া গোটা মাসে একটি ট্যাকা। এক এক কোটালে আটখানা নৌকায় (২৪ জন দাঁড়ি মাঝি) এক থেকে দেড় হাজার টাকার মাছ উঠত। টাকায় চার পয়সা দৈনিক সুদে ক্যানিং-এর মাছের মহাজন (শিশুপদ মহাজন বলেন না) পাঁচ ছশ অবধি ধার দিত। মাছ মেরে ধার শোধ দিতাম।

ছ সাত বছরের মধ্যে মহাজনের দেনা টেনা শোধ করে শিশুপদ ঝাড়া হাত পা হয়ে উঠল। বিয়ে করল রেণুবালাকে। পাঁচ মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে উষারাণীর বিয়ে হয়েছে ষাট মাইল দূরে হাসনাবাদের মালঞ্চ গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক গোকুল মণ্ডলের সঙ্গে। জেলেকূলে শিশুপদ রীতিমত মাতব্বর ব্যক্তি। চারখানা নৌকো ও সাতখানা জালের মালিক। ছ' বিঘা ধেনো জমি থেকে বছরে গড়ে আঠারো মণ ধান পান। খাবার জন্য ঘরে প্রয়োজন সম্বৎসরে ছত্রিশ মণ। দুটি নৌকো ভাড়া খাটিয়ে ফি কোটালে আয় হয় চল্লিশ টাকার মত, অর্থাৎ মাসে প্রায় আশি টাকা।

আরামপুরের মাঝখানে সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর ছ' ভাইয়ের বসত ভিটে। ছ' ভাইয়ের ছখানা মাটির ঘর। সবাই পৃথগন্ন। মাঝে ধানের গোলা। ওই গোলার পাশেই এদিনের শোকসভার আয়োজন। প্রায় মাইল-খানেক হেঁটে এসে এতক্ষণে একটু জিরোনের সুযোগ মিলল। কিন্তু শিশুপদ নন স্টপ বকে চলেছেন। মূল প্রসঙ্গ বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন, শুধু আত্ম-কাহিনীর রোমন্থন। গাঁয়ের মানুষজন অতিথি সেবা থেকে সব ব্যাপারেই দিল খোলা, অকৃপণ।

লুঙ্গি : ২। গামছা : ৪

নিজের গল্প দিয়ে গোটা আরামপুরের অর্থনীতির একটা রূপরেখা শিশুপদ খাড়া করছিলেন : দৈনিক চার কিলো চাল লাগে। তিন বেলাই ভাত। সপ্তাহে দু কিলো গম। দৈনিক বাজার আট আনার ; নিজের সারা বছরে

লাগে একটা কাপড়, দুটি লুঙ্গি, তিনখানা গেঞ্জি, দুখানা সার্ট ও চারখানা গামছা। স্ত্রী রেণুবালার জন্য বছরে বরাদ্দ দুখানা শাড়ি। ছ'ভাই ওরা যখন একসঙ্গে ছিলেন (১৯৬৮ সাল পর্যন্ত) তখন বছরে ডাক্তারে ওষুধে লাগত তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা। এখন সবাই সাবলম্বী। রামপদ, হৃদপদ দুজনে চাষী—প্রত্যেকে ছ বিঘা জমির মালিক। তৃতীয় প্রফুল্লকুমার গোসাবা হাটে কাপড়ের দোকান খুলেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম গৌরচন্দ্র ও বাসুদেব ওই হাটেই স্বতন্ত্র দুখানা মুদির দোকানের মালিক।

বছরে দুখানা সিনেমা শিশুপদ দেখেন। গোসাবার কাছারি বাড়ির সামনের মাঠে টেমপোরারি সিনেমা হল ন' মাস চলে, তিন মাস নেই। জীবনে একবার কলকাতায় এসেছেন। ক্যানিং-এ ফি মাসে হাপর বোঝাই মাছ নিয়ে দুবার যান বেচতে। বসিরহাটে দু মাসে একবার। যুক্তফ্রণ্টের আমলে জমি জবর দখলের মামলা। ওরা ছত্রিশ জন জড়িত। উনসত্তর সাল থেকে ওই মামলা চলছে। এর মধ্যে চারজন তো মরেই খালাস। শিশুপদ বিড় বিড় করে বললেন, বাঘে ছুঁলে আঠারো আর মামলায় ছুঁলে বাবু ছত্রিশ ঘা। প্রতিবার বসিরহাটে যাই, আমরা বত্রিশজন মাথাপিছু দু'টাকা করে দিই উকিলবাবুকে। যাতায়াত খাওয়া থাকায় আরো যায় জনপ্রতি বিশ-বাইশ টাকা।

অন্ধকারে ঠাহর হয় না, কতটা লজ্জা শিশুপদর ভাবলেশহীন মুখে খেলে গেল। বললেন, হ্যাঁ যা বলছিলুম। অজিত, সুনীল, অখিল, অমিয় সবাই মিলে চামটা দ্বীপে নেমে সকালবেলা কেলে লতা কাটছিল। টেরও পায়নি কখন তিনি এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুটি পা অজিতের কাঁধে ক্যাজুয়ালি তুলে দিয়ে বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে যখন ডাক ছাড়লেন—হে-আ-আ-উ, তখন আর সময় নেই। অজিতের সঙ্গী সাথীরা দা কুড়োল ফেলে দিয়ে হরিণের গতিকে হার মানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতার কেটে নৌকোয় উঠে দাঁড় বেয়ে মাঝ নদীতে পৌছে যখন কাঁপুনি একটু থামল, ততক্ষণে বহুদূরে দ্বীপের প্রায় মাঝখান থেকে তৃপ্ত বাঘের জলখাবারের পালা শুরুর আর একটা ডাক শোনা গেল। ওই ঘটনার প্রায় এক মাস বাদে এই শোকসভা।

বিধবা গ্রাম

মাথার উপরে নৌকোর পাল একখানা দড়ি দিয়ে শিশুপদদের ভিটের চারধারের কুড়ে ঘরের বাঁশের সঙ্গে বেঁধে সামিয়ানার চেহারা দেওয়া হয়েছে ; এক মাইল দূর থেকে ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারির ওষুধের টেবিল আনা হয়েছে, সেই সঙ্গে দুটো চেয়ার আর রোগীদের কাছে একখানা লম্বা বেঞ্চি। টেবিলের উপর হ্যাজাক। অতিথিদের জন্য কাচের গ্লাসে চা। সভা শুরু হল। মাটির উপরে উবু হয়ে বসে চল্লিশ পঞ্চাশজন জোয়ান-মদ্দ, কচি কাচা, বুড়ো রাজবংশী ও মালো। বনবিবির থানে পিদিম জ্বলছে। সুন্দরবনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বনবিবির থান। মাটির তৈরী দেবী মূর্তি কোথাও জগদ্ধাত্রীর মত, কোথাও অপটু কারিগরের হাতের কাজের ফলে প্রায় বিমূর্ত। ব্যাঘ্র-বাহিনী দেবীর গোলাপী আকৃতি পিদিমের আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট। চারপাশের মেটে ঘরের দাওয়ায় সার বেঁধে উলঙ্গ সব শিশু ও কিশোর। আর এক কোণে ডজন কয়েক থান পরা মহিলা। সবাই বিধবা। সবার স্বামী বাঘের খাদ্য হয়েছেন। তাই সবাই আজ অবাক হয়ে দেখতে এসেছেন অজিতের বৌ-এর সৌভাগ্য। বাঘে খাওয়া এমন কী একটা ঘটনা যে তার জন্যে ঘটা করে সভা হবে, দুঃখু জানানো হবে, বক্তৃতা দেবেন বাবুরা আর সবশেষে মাগীর হাতে দুশটি টাকা দেবেন ডাক্তারবাবু! এমনতর অনাছিষ্টি কাণ্ডকারখানা বাপের জন্মে জেলেপাড়ায় কে কবে দেখেছে? কই তাদের স্বামীরা যখন গেল, এমনতরো সভা-টভা তো তখন হয় নি। অজিতের বৌ সত্যি সৌভাগ্যবতী। হাতে নগদ দুশ টাকা পাবে, আবার ফি মাসে দশটি করে টাকা। জেলেদের নিয়ে সমবায় সমিতি গড়ে এই সব নতুন বিধি ব্যবস্থা ডাক্তারবাবুই চালু করেছেন ওই তল্লাটে। সত্যি সত্যি টাকাটা পাবে কিনা—খানিকটা অবিশ্বাস খানিকটা ঈর্ষা নিয়ে ওরা এসেছেন এই সভায়। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠলেন ডাক্তার বর্মন। বছর দেড়েক আগে ওই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম।

ডাক্তার বর্মন জেলেদের বোঝাচ্ছিলেন : প্রতি বছরই চার পাঁচজন বাঘের পেটে যায়। যারা যায়, তারা যায় সেই সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে যায় পরিবার

পরিজন ছেলেমেয়ে বৌ বাচ্চাদের। ভবিষ্যতে ঘরের লোক যাতে আর কষ্ট না পায়, তার জন্য এবার থেকে আমরা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির তরফ থেকে 'অ্যাক্সিডেণ্ট' বীমা করাচ্ছি।

অ্যাক্সিডেণ্ট

অ্যাক্সিডেণ্ট কথাটার কোন মানে হ্যাজাকের আলো ঘিরে বসা মানুষগুলির চোখ মুখে খুঁজে পেলাম না। তারা নির্বিকার। ডাক্তার বর্মন এই মানুষগুলির শুধু রোগের নয় আর্থিক চিকিৎসাও শুরু করেছেন। মাছ-মারাদের মেরে মেরে ক্যানিং-এর মহাজনরা লাল হয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মত ছুঁড়ে মেরেছেন এই সমবায় সমিতি। তাতে ক্যানিং-এ মাছের বাজার রীতিমত চটিতং। দু একবার ডাক্তারকে শাসানো হয়েছে। প্রাণের ভয়ও দেখানো হয়েছে। সে কথা উঠলে ডাক্তার শুধু হাসেন।

ডাক্তারের কথা শুনেছি হ্যামিলটন ট্রাস্টের সবচেয়ে পুরোনো কর্মী জঙ্গবাহাদুর পাণ্ডের মুখে। ইউ পির গাজিপুর জেলার অবহৌতি গ্রাম থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাপের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিল জঙ্গবাহাদুর। এখন বয়স প্রায় আটষট্টি। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ। টকটকে গায়ের রং। ধুতি পাঞ্জাবি, খালি পা। স্যার ডানিয়েলের খাস বেয়ারা ছিলেন। ট্রাস্টের চাকরি ১৯২৯ সাল থেকে। পিওন, মাহিনে তখন ছিল চোদ্দ টাকা।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন গোসাবায়। সঙ্গে পুত্রবধূ ও কন্যা। আরো কয়েকজন। স্যার ও লেডি হ্যামিলটনের অতিথি। রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন পুরোনো জেটিঘাটের ধারে বর্তমান থানার গায়ে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ছোট বাংলোয়। জঙ্গবাহাদুরের সব মনে আছে: দেবতার মত চেহারা বাবু। চোখ দুটো সর্বদা হাসত। গায়ে জোব্বা, ধবধবে দাড়ি। তিন দিন ছিলেন। সারাদিন গান আর গান। খুব ভোরে উঠতেন। সকালবেলা বড় বাংলো (যেখানে হ্যামিলটনরা থাকতেন) থেকে হ্যামিলটনের খাস বাবুরচি জগনাথ আর রামনাথ চা নিয়ে যেত ছোট বাংলোয়। বাবুরচিরা জাতে দোসাদ, চামার বাবু—বিহারের বালিয়াতে বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের কোন বাছবিচার ছিল না—কনৌজি ব্রাহ্মণ জঙ্গবাহাদুর বলে চলে। চায়ের পর ফল খেতেন। কলকাতা থেকে আনানো কমলা, নাশপাতি আর গোসাবার কলা। দুপুরে ভাত।

আস্ত ভেটকি

আমরা যেমন থালার উপর গোল করে ভাত সাজিয়ে দিই, রবীন্দ্রনাথের তা চলত না। লম্বা ফালি, একখানা পিঠের মত, থালার ওপর ভাত সাজানো থাকত। সঙ্গে এক বাটি ঘন মশুরীর ডাল। টমেটো ও লেটুশ পাতার স্যালাড। আর একখানা ভাপে সেদ্ধকরা আস্ত ভেটকি মাছ। খানিকটা তরকারী।

রবীন্দ্রনাথের চলাফেরায় যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার জন্য হ্যামিলটন একটা টানা রিক্সা আনিয়ে রেখেছিলেন। কবি চড়তে চাইতেন না। স্যার লেডি নাছোড়বান্দা। রবীন্দ্রনাথ বাঘ দেখেছিলেন? জঙ্গবাহাদুরের জবাব: না বাবু উনি এসেছিলেন গোসাবার স্কুল ও মানুষজন দেখতে। কবি চলে গেলেন, তার সাত বছর বাদে হ্যামিলটন গেলেন মারা, ট্রাস্টও ঝিমিয়ে পড়ল। ত্রিশ বছর বাদে উনসত্তর সাল নাগাদ ডাক্তারবাবু ট্রাস্টী হওয়ার পর আমার সব একটু একটু চাঙা হয়ে উঠছে।

ব্যাংক হয়েছে, বাঘের অফিস, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চের গবেষণা কেন্দ্র এবং ওই সমিতি। ডাক্তারবাবুর ইচ্ছে এখানে সেই পুরোনো দিনের মত আবার ধর্মগোলা হোক, পাকা রাস্তা হোক, গড়ে উঠুক হেলথ সেণ্টার, ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, শেষ হোক মহাজনী মন। কিন্তু তা তো হবার নয়। ট্রাস্ট যে ঠুঁটো জগন্নাথ। সব জমি জায়গাই যে সরকারের হাতে। ট্রাস্টের পাওনা টাকাও আজ ট্রাস্ট পাচ্ছে না। ডাক্তার বর্মণ তখনো বলে চলেছেন: ট্রাম বাসের অ্যাকসিডেণ্টের জন্য তো কলকাতা থেকে ট্রাম বাস তুলে দেওয়া যায় নি, তখন মানুষ খায় বলে সুন্দরবন থেকে ঝাড়ে-বংশে বাঘকে তো আর নির্মূল করা যায় না, উচিতও না।……

ডাক্তার বর্মণ ভাষণ দিচ্ছেন। প্রায় ছ ফুট লম্বা শক্ত সমর্থ মানুষ; ষাটের কাছে বয়স। দেশ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। কলকাতার নীলরতন থেকে ছেচল্লিশে ডাক্তারি পাশ করে আটচল্লিশ সালে স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন এস্টেটের ডাক্তারের চাকরি নিয়ে সেই যে এসেছেন আর এ জায়গা ছাড়েন নি। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়ে ডাক্তার, জামাইও ডাক্তার। দুজনে এখন স্টেটসে। মেজ মেয়ের স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। দুই ছেলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। একটা বাড়ী করেছেন ভবানীপুরে। কিন্তু স্ত্রী শোভারাণীকে নিয়ে গত ত্রিশ বছর পড়ে রয়েছেন এই গোসাবায়।

গোসাবা শব্দটি শুনলে মনে হয় যেন কতদূরে। অথচ কলকাতা থেকে বর্ধমান যতটা, গোসাবাও প্রায় ততটা। শিয়ালদা থেকে ক্যানিং রেলে মাইল আঠাশ। ফার্স্ট ক্লাশের ভাড়া ষোল টাকা, আর সার্বজনীন শ্রেণীর এক টাকা পঁচাত্তর। ক্যানিং থেকে বত্রিশ মাইল জল উজিয়ে যেতে হয় গোসাবায়। মাতলা, পুরন্দর, বাসন্তী ও গোসাবা চারটি নদী হয় পেরোতে। লঞ্চের খোলের ভাড়া যাত্রীপিছু একটাকা পঁয়ষট্টি আর মাথার উপরে কেবিনের ভাড়া তিন টাকা। ক্যানিং থেকে রোজ তিনখানা লঞ্চ যায় গোসাবায়—সকাল দশটায়, দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। আসে চারখানা। গোসাবা থেকে ছাড়ার সময় সকাল চারটা, সাতটা, দুপুর সাড়ে বারোটা আর বিকেল পাঁচটা। সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা! এক লব্‌ঝড়ে লঞ্চ তায় চড়া পড়ে পড়ে নদীগুলির প্রায় মরণদশা। তাই এত সময় লাগে।

ভাষণ শুনতে শুনতে সেদিন জানার কৌতূহল হয়েছিল, প্রতিবছর কত লোক যায় বাঘের পেটে? যারা যায় তারা কারা? তাদের পেশা কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঘ চক্কোত্তি

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কল্যাণ চক্রবর্তীর কাছে প্রশ্নগুলি তুলে ধরলাম। ভদ্রলোক গোসাবায় অফিস খুলে বসেছেন। হ্যামিলটন সাহেবের কাছারিবাড়ির তেতলায়। সারাটা বছর লঞ্চ নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন। পোষা জীবজন্তু তো অনেকেই ভালবাসেন, বুনো বাঘকে ভালবাসার কথা কল্যাণকে দেখায় আগে কল্পনাতেও কোন দিন প্রশ্রয় দিই নি। স্ট্যাটিসটিক্সের এম এস সি কল্যাণের বয়স পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। বিয়ে করেন নি। সংসার বলতে সব কিছু বিধবা মাকে ঘিরে। ধ্যান জ্ঞান বলতে বাঘ। ওর অফিস ঘরের দেওয়ালে বাঘ, টেবিলে বাঘের উপর লেখা বিশেষজ্ঞদের পুঁথিপত্র, আর বাঘ সংক্রান্ত অজস্র সরকারী ফাইল, ঘরের বাইরে কাঠের আলমারী ভরতি বাঘের পায়ের ছাপ তোলা প্ল্যাস্টার অব প্যারিসের কয়েক হাজার ছাঁচ। অবসরও কাটে বাঘ চর্চায়।

হিসাব চাইতে নিজের লেখা একটা প্যাম্ফলেট পড়তে দিলেন। নাম:

ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি অন দ্য সুন্দরবন ফরেস্টস—অবজারভেশন অন টাইগারস। সহলেখক এ বি চৌধুরী। সুন্দরবনের আঠারোটি দ্বীপপুঞ্জে ষাটের দশকে এক যুগে তিনশ ষাটজন বাঘের খোরাক হয়েছে। হিসেবটা তুলে ধরছি—চামটা—৮০, মাতলা—৪১, গোসাবা—৩৭, পীরখালি—২২, বাঘনারা—২৮, গোমা—২১, চুলকাটি—৪, ঝিলা—৪, হেড়োভাঙ্গা—৩, নেতিধোপানী—১৭, আজমলমারি—১৭, মায়াদ্বীপ—১৬, চাঁদখালি—১৬, পঞ্চমুখানি—১৪, আরবেসি—৮, হরিণভাঙ্গা—১৬, কাটুয়াঝরি—১২, ছোট হরদি—১০। অর্থাৎ বছরে প্রতিটি দ্বীপ গড়ে দুটি করে মানুষ খায়।

যাদের খায় তারা কারা? তারা হলেন জেলা চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে ৩৭১৮-১৩ বর্গমাইল বিস্তৃত সুন্দরবনের পনেরোটি থানার বাইশ লক্ষ মানুষেরই আত্মীয়-স্বজন। শুরু করেছি গোসাবার একটি শোকসভা দিয়ে। সেই গোসাবা হল গোটা সুন্দরবনের সামান্য একটি অংশমাত্র। গোসাবা ছাড়াও আরো চোদ্দটি থানা হল—সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর, পাথর-প্রতিমা, জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং, বাসন্তী, হারোয়া, মিনাখাঁস, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ। জল ও জঙ্গল এলাকা বাদ দিলে ১৯৭১-এর আদম-সুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির সংখ্যা হল ৯৯০। প্রকৃত জঙ্গলের পরিমাণ আজ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে মাত্র ৪২২০-২৯ বর্গ কিলোমিটার। আসল সুন্দরবন, যার বেশির ভাগই পড়েছে বাংলাদেশে।

আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী সুন্দরবনের বাইশ লাখ লোকের মধ্যে শতকরা ছিয়াশি ভাগের জীবিকার সূত্র জমি জল ও জঙ্গল। অর্থাৎ চাষবাস, কাঠকাটা, মাছ মারা ও মধু সংগ্রহ।

আর ওই মাছ মারতে গিয়েই, কাঠ কাটতে গিয়েই, মধু সংগ্রহ করতে গিয়েই ১৯৭৫ সালে বাঘের হাতে বেঘোরে মারা পড়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিষ্ণু মণ্ডল (বয়স ৭০), হারান মিস্ত্রী (৬৫), কার্তিক মণ্ডল (৭০) ও বিদ্যানগরের বিষ্ণুপদ মিস্ত্রী (২১)। ওই বছর পয়লা এপ্রিল থেকে ২৪ জুলাই, প্রায় চার মাসে বাঘের মুখে পড়েছিল চুয়াল্লিশজন, মারা গিয়েছেন একচল্লিশ জন। এর মধ্যে কাঠুরে চারজন—হেঁতাল গাছের পাতা ও কাণ্ড, ঘর ছাউনী ও বেড়ার কাজে যা লাগে, বন থেকে কাটতে গিয়ে দুজন বাঘের খাদ্য হন। মৌলি তেরোজন। আর মাছ-মারা চব্বিশ জন। মৃত একচল্লিশ জনের মধ্যে ষোল জনের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। বাঘ সাধারণত আক্রমণের সময় হিসাবে বেছে নেয় সকালবেলাটা—ছটা থেকে আটটা তখন

কাঠুরে, জেলে ও মৌলিরা নৌকা ছেড়ে নানা প্রয়োজনে নামে জঙ্গলে। যে চুয়াল্লিশ জন বাঘের মুখে পড়েছিলেন তাদের ঠিকানা গোটা সুন্দরবন জুড়ে ছড়ানো: সাতজেলিয়া, আমলামেথি, হিরণ্ময়পুর, ছোট মোল্লাখালি, আরামপুর, বেলতলি, লাহিড়ীপুর, মসজিদবাড়ি, ঢুলকি, রামকৃষ্ণপুর, পাটখালি, কাগিতলা, বরুণহাট, বিজয়নগর, বিরাজনগর ইত্যাদি অজ্ঞাত অখ্যাত সব গ্রাম।

বাঙালী মাছে-ভাতে বাঁচে। সুন্দরবন বছরে গড়ে আড়াই হাজার টন মাছ জোগান দেয়। এই মাছের মধ্যে আছে—গলদা চিংড়ি, পারসে, ভাঙন, হন্যে চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, ভেটকি, পয়ারা চাঁদা, ইলিশ, পাঙাস, শোল, তপসে, চাঁদা, কানমাগুর, মেধ, গুরজাউলি, লটে, রূপবতী, নোনা ট্যাংরা, ফ্যাসা ইত্যাদি। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি— এই ছ মাস হল সুন্দরবনে মাছ মারার সময়—ওই সময় প্রতিদিন কম করে গড়ে ছ হাজার জেলে সুন্দরবনের জলে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাছের সন্ধানে। জেলের মোট সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার।

মাছের খাদ্য হল নানা ধরনের শ্যাওলা ও গাছের ফল। সুন্দর নের নদী নালায় প্রায় একশ জাতের শ্যাওলা পাওয়া গিয়েছে। আর জঙ্গল বলতে মূলত গরান, গেওয়া, পশুর, ধুঁধুল, বাইন, কেওড়া ও সুন্দরী গাছ। কানমাগুর ও পাঙাস মাছ কেওড়া ও বাইনের ফল খেতে ভালবাসে। বারো কিলো ওজনের একটা পাঙাসের পেট চিরে বিশেষজ্ঞরা এক কিলো পরিমাণ বাইন ফল পেয়েছেন।

যে-সব গাছের কথা উল্লেখ করেছি তাদেরই ডাল, পালা ও কাণ্ড কাঠুরেদের নৌকা বোঝাই হয়ে কলকাতায় বারো মাস চালান আসে। কিছু কাঠ সস্তার আসবাবপত্র তৈরিতে লাগে, বাকি কাঠের ব্যবহার জ্বালানী হিসাবে। খুব কম করেও বিশ হাজার মানুষের জীবিকার সূত্র এই বনের কাঠ।

সুন্দরবন নাম নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কেউ বলেন, সমুদ্র সংলগ্ন বন, তা থেকে আদিতে নাম ছিল সমুদ্রবন। লোক মুখে পরিবর্তিত হয়ে আজ হয়েছে সুন্দর বন। আবার কারো কারো বক্তব্য সুন্দরী গাছের প্রাধান্য ওই বনে দেখতে পেয়ে নাম রাখা হয়েছিল সুন্দরী-বন, তাই থেকেই আজকের নাম সুন্দরবন। কাঠুরেদের কৃপায় সুন্দরবনে আজ সুন্দরী গাছই হচ্ছে সবচেয়ে বিরল।

মৌলি, জেলে ও কাঠুরে যারাই বনে ঢোকেন সকলেরই এক চিন্তা অজিত মণ্ডলের মত প্রাণটা না যায়। কারণ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।

সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর বাঘকুলে দ্বিজোত্তম বলে খ্যাত। জন্মসূত্রে নরখাদক, হিংস্রতায় নজিরহীন, চূড়ান্ত ধূর্ত এবং ব্যাঘ্র বংশে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে পরিচিত।

নুন ও নরমাংস

সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে বিভিন্ন প্রাণী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছেন। বিশ্ব বন্যপ্রাণী ভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং লণ্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটির সায়েনটিফিক ফেলোগাই মণ্টকোর্য়ট ১৯৭২ সালে বাংলা দেশের খুলনায় গিয়েছিলেন বাঘ দেখতে, সুন্দরবনের বাঘকে জানতে। জঙ্গলে ছিলেন কয়েকমাস। ফিরে গিয়ে একখানা বই লিখেছেন: 'টাইগারস।' ওই বই-এর উনিশ পাতায় অপর এক জীব বিজ্ঞানী ডঃ হুবার্ট হেনড্রিক্সের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মনকোর্ট লিখেছেন: 'জল-তলের উচ্চতা এবং জলের লবণাক্তর সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতা ও নরমাংস ভক্ষণের সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে নিবিড়। যুগ যুগ ধরে নদীর ওই নোনা জল খেয়ে খেয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে সুন্দরবনের বাঘের শারীরিক বহু পরিবর্তন হয়তো সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঘের লিভার ও কিডনী।' হেনড্রিক্স দীর্ঘদিন সুন্দরবনে কাটিয়ে গিয়েছেন। এরপর মনকোর্ট নিজের মন্তব্য জুড়েছেন ওই বই-এর ৪২ পৃষ্ঠায়: ১৬৬০ সাল ইস্তক যতদূর জানা যায়, সব না হলেও সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘই নরখাদক। বাঘের শিক্যর হল মৌলি, কাঠুরে ও জেলের দল।' মনকোর্ট খোলাখুলি বলেছেন, ওই নোনা জলই সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতার মূল কারণ।

মধু ও মোম

মাছ মারা, কাঠ কাটাদের পরেই আসছে মৌলিরা যারা জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে গাছের গড় উচ্চতা পনেরো থেকে ত্রিশ ফুট। ত্রিশ ফুট লম্বা গাছ খুব কমই চোখে পড়ে। সাধারণতঃ ওই ধরনের বড় গাছের দলে পড়ে কেওড়া ও গন্দর। মৌমাছিরা চাক বাঁধে সাধারণতঃ পাঁচ থেকে

দশ ফুট উচ্চতার মধ্যে। একটা হিসাব এখানে দিচ্ছি তাতেই স্পষ্ট হবে বছরে কত লোক মধু সংগ্রহে জঙ্গলে ঢোকে এবং সারা বছর কি পরিমাণ মধু ও মোম সংগৃহীত হয়।

বছর	মৌলির সংখ্যা	সংগৃহীত মধুর পরিমাণ	সংগৃহীত মোমের পরিমাণ
১৯৬৩-৬৪	১৩৫২	১৩২৩-৮ কুইন্টল	১০০-১ কুইন্টল
১৯৬৪-৬৫	৯১৩	৫৯৯-৬ ,,	৩৪-২ ,,
১৯৬৫-৬৬	১০৭০	৯৫৯-২ ,,	৬৭-৮ ,,
১৯৬৬-৬৭	৯৪৪	৭৭৩-০০ ,,	৬২-৬ ,,
১৯৬৭-৬৮	১১৪০	৮৮৯-৫ ,,	১২৮-৫ ,,
১৯৬৮-৬৯	১১০৭	৭১৮-৬ ,,	৭১-০০ ,,
১৯৬৯-৭০	১০১৬	৬৮০-৫ ,,	৫৭-৩ ,,
১৯৭০-৭১	১৪৭৬	৯১২-৯ ,,	৭৪-৭ ,,
১৯৭১-৭২	১৪৯৫	৮৯০-০০ ,,	৭২-১ ,,

রগচটা

কল্যাণবাবু এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেন এইভাবে: অতিরিক্ত নুন শরীরে গিয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে মানুষ যেমন চট করে চটে ওঠে, ভদ্রতার আড়ালে লুকোনো দাঁত বার করে ফেলে, তেমনি বাঘও। এমনিতেই জীবকূলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই চতুষ্পদটি; তার ওপর হাজার হাজার বছর ধরে রক্তে নুনের পলি পড়েছে। তাই এখন প্রায় বিনা কারণেই হিংস্র হয়ে ওঠে, মানুষ খুন করে, ক্ষিদে না পেলেও।

চক্রবর্তী ও চৌধুরী দুজনে মিলে অংক কষে তাদের গবেষণাপত্র দেখিয়েছেন, সুন্দরবনের বাঘের মুখে মানুষ মারা যায় সবচেয়ে বেশি এপ্রিল মাসে। তারপরেই জানুয়ারিতে। কারণ দেখাতে গিয়ে ওরা বলেছেন, এপ্রিলের পয়লা থেকে শুরু হয় সুন্দরবনের মধুমাস—মধু সংগ্রহের মরশুম এপ্রিল থেকে ১৫ জুন। কিন্তু শীতের মাস জানুয়ারিতে কেন তার পরেই বেশি মানুষ বাঘের খাদ্য হয় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাদের প্রশ্নবোধক অনুমান: নর ও মাদী বাঘের বছরের ওই সময় উর্বরতা হ্রাসের দরুণই কী হিংস্রতা চাগাড় দিয়ে ওঠে?

সুন্দরবনের বাঘ সর্বভুক। মানুষ, হরিণ, শুয়োর, মাছ, বানর, কাঁকড়া, মৌচাক কিছুই বাদ দেয় না। বাঘের পেট থেকে মানুষের হাড়গোড়, হরিণের শিং, পাখির পালক পাওয়া গিয়েছে। আক্রমণ করে শিকারের পেছন দিক থেকে। ঘাড়ের ডানদিকটা কামড়ে ধরে। আজ পর্যন্ত যত মানুষ বাঘের মুখে পড়েছে তার মধ্যে মাত্র ২৮-৫ শতাংশের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

২-৬১ মিটার

বাঘের পায়ের ছাপ বা কড পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সুন্দরবনের বাঘের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি তথ্য আবিষ্কার করছেন। এখানে এ বি চৌধুরী ও কল্যাণ চক্রবর্তীর আর একটি গবেষণাপত্র (ডেভলপমেণ্ট অব সুন্দরবন ফরেস্টস—এ সায়েন্টিফিক স্ট্যাডি) থেকে সুন্দরবনের নর-বাঘের কয়েকটি ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স তুলে ধরছি (সবই পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত বয়সী): কডের দৈর্ঘ ০-১৪ মিটার, লেজের দৈর্ঘ ০-৭৭ মিটার, লেজ সমেত একটা গোটা বাঘের দৈর্ঘ ২-৬১ মিটার, লেজ ছাড়া ১-৮৪ মিটার।

বাঘ বাঁচে কুড়ি থেকে বড় জোর পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এবং জন্ম, বাড় ও মৃত্যু সবই নির্ভর করছে তার খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তার উপর।

একদা এই বনে গণ্ডার, জলাজমির হরিণ ও প্রচুর বুনো মোষ ছিল। সে সব এখন আর নেই। আছে মাত্র হাজার বারো চিতল হরিণ, হাজার দুই শুয়োর, অজস্র বানর, সাপ এবং জলে হাঙর, কামট, কুমীর ও মাছ। সবই বাঘের খাদ্য কিন্তু তিন বছর আগেও বাঘ ছিল কিছু শখের শিকারী ও ব্যবসায়ীর বন্দুকের খোরাক। কলকাতার বাজারে একটি প্রমাণ সাইজের বাঘের চামড়ার দাম কম করে পনেরো হাজার টাকা। বিদেশে ওই চামড়াই পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি হয়। বাঘের দোহাই পেড়ে সুন্দরবনের ধানী মানী গেরস্থ বহু মানুষ হাজার হাজার বন্দুকের লাইসেন্স আদায় করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পশ্চাদপদ এলাকা বলে পরিচিত সুন্দরবনের মাত্র একটি গ্রাম কুমীর-মারিতে খুব কম করেও একশ খানা বন্দুক আছে। বসিরহাটের এক বন্দুক ব্যবসায়ীকে জানি, যিনি সারা বছর নৌকো করে সুন্দরবনের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ান খদ্দেরদের কাছ থেকে গুলি বন্দুকের দাম আদায় করতে। এমন কি তিন বছর আগে সুন্দরবনের আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাঘ্র

প্রকল্পের অধীন বলে ঘোষণা করার পরও এই ভদ্রলোককে দেখেছি প্রকল্পভুক্ত এলাকার গাঁয়ে গাঁয়ে ব্যবসা সূত্রে ঘুরে বেড়াতে। তার খদ্দেরদের দৌলতেই ১৯৭২ সাল নাগাদ বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে শেষমেশ ১২০-তে এসে ঠেকে। আইন করে বাঘ মারা নিষিদ্ধ হওয়ার পর, কল্যাণবাবুদের টহলদারি বাড়বার পর গত তিন বছরে ওই সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। গত মার্চের হিসাব: সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা এখন ১৮১। এর চার আনাই কাচ্চা-বাচ্চা।

১১ হাজার হরিণ

বাঘ চক্কোত্তির (কল্যাণবাবু মাফ করবেন) দেওয়া হিসাব অনুসারে প্রতিদিন একটি বাঘের প্রয়োজন দশ কিলো মাংস। তাহলে সারা বছরে ১৮১টি বাঘের প্রয়োজন ১৮১ × ৩৬৫ × ১০ কিলো বা ৬,৬০,৬৫০ কিলো। একটি হরিণের ওজন যদি ষাট কিলো, তাহলে ওই পরিমাণ মাংসের জন্য বছরে দরকার প্রায় এগারো হাজার হরিণ। বর্তমানে হরিণের সংখ্যা যে বারো হাজার তা আগেই বলেছি। শিকার আইনত বন্ধ হওয়ায় বংশবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে হচ্ছে বলে বন দফতরের ধারণা। কিন্তু আমার বিপরীত—বাঘকে ছুঁলে আইন অনুযায়ী জেল পুলিসের ভয়, তাছাড়া মাংসটা কাজে লাগে না, ধরা পড়ার আশংকা, কিন্তু হরিণের যে সবকিছুই মানুষ কাজে লাগায়। তাই নির্জন অরণ্যে বন্দুকের আওয়াজ লোকালয়ে পৌঁছোয় না, অথচ চোরাই পথে আজও হরিণের মাংস কলকাতায় যে আসে তার খবর পাই। বাড়ি বাড়ি গোপনে চালান যায়।

সুন্দরবনে যতবার গেছি সাধারণ মানুষের কাছে বারবার একই অভিযোগ শুনেছি: বাঘ বাঘ করে কলকাতা পাগল, এদিকে বাঘ বাঁচানোর জন্য যে মানুষ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে কাঠ কাটা চলবে না. নদীতে মাছ মারা চলবে না, সবেতেই যদি বাঘের ব্যাঘাত হয়, তাহলে আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের যে বিকল্প কোন জীবিকা নেই।

দুনিয়ার বাঘ এবং আমাদের

(ক) (১) বিশ্ব বন্য প্রাণী ভাণ্ডারের হিসাব অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯১৮) সারা পৃথিবীতে বাঘ ছিল: ১,০০,০০০।

(২) ওই ভাণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫২ সালে পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা : ৫,০০০।

(খ) (১) খ্যাতনামা বন্য প্রাণী সংরক্ষণকামী ই পি গীয় হিসাব অনুযায়ী চলতি শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে বাঘের সংখ্যা : ৪০,০০০।

(২) জিম করবেটের মতে ১৯৫৫ সালে ভারতে বাঘের সংখ্যা ২,০০০।

(৩) ১৯৬৯ সালের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাঘ সুমারি অনুযায়ী মোট বাঘের সংখ্যা : ২,৫০০।

(৪) ১৯৭২ সালের বাঘ সুমারি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে বাঘের হিসাব :

অন্ধ্র—৩৫, অরুণাচল—৬৯, আসাম—১৪৭, বিহার—৮৫, গুজরাট—৪, কেরালা—৬০, মণিপুর—১, মধ্যপ্রদেশ—৪৫৭, মেঘালয়—৩২, মহারাষ্ট্র—১৬০, মহীশূর—১০২, নাগাল্যাণ্ড—৮০, ওড়িশা—১৪২, রাজস্থান—৭৪; তামিলনাড়ু—৩৩, ত্রিপুরা—৭, উত্তরপ্রদেশ—২৬২ ও পশ্চিমবঙ্গ—৭৩।* মোট ১৮২৭।

* রাজ্য বন দপ্তরের মতে ওই হিসাব ঠিক নয়। এক সুন্দরবনেই ওই বছর ১২০ বাঘ ছিল।

বাঘ : পশ্চিমবঙ্গ ও সুন্দরবন

১৯৭২ সালে বাঘ সুমারিতে পশ্চিমবঙ্গে বাঘের সংখ্যা দেখানো হয় ৭৩। ওই সুমারি অনুযায়ী তখন রাজ্যের বিভিন্ন বনে বাঘের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : বকসা—১৭, কার্শিয়াং—৭, কোচবিহার—৭, বৈকুণ্ঠপুর—৭, জলপাইগুড়ি—৬, কালিম্পং—২ এবং সুন্দরবন—৭৩।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই হিসাবের সঙ্গে রাজ্য বন দপ্তর একমত নন। চব্বিশ পরগণার তদানীন্তন ডি এফ ও এ বি চৌধুরীর মতে ওই বছর এক সুন্দরবনেই বাঘের সংখ্যা ছিল ১২০।

১৯৭৩ সালের বাঘ সুমারির সময় সুন্দরবনের ২৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ১১৯টি দ্বীপে ব্যাপকভাবে গণনা করা হয়। প্রতিটি দ্বীপকে গণনার সুবিধার জন্য ১৫টি ব্লকে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ব্লককে ৫টি কম্পার্টমেণ্টে পুনরায় ভাগ করা হয়। প্রতি কম্পার্টমেণ্টের জন্য ৫ জন বন কর্মী নিয়ে এক একটি গণনাকারী দল গঠিত হয়। ভারতে বাঘ গণনার দিক থেকে সুন্দরবনের এক বিষয়ে সুযোগ সর্বাধিক। নদীর পাড়ে নরম মাটিতে

বাঘের পা বা কড়ের ছাপ স্পষ্ট আকারে পাওয়া যায়। ওই ছাপের ওপর কাঁচ রেখে তার ওপর ট্রেসিং পেপার ফেলে আগে ছাপ নেওয়া হয়। পরে তরল প্লাস্টার অব প্যারিস ঢেলে তুলে আনা হয় কড়ের হুবহু অনুকৃতি। মানুষের আঙুলের ছাপ প্রতিটি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বাঘের কড়েরও। তদনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১৮১।

জবাবটা সরাসরি দেওয়া সম্ভব নয়। একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি। জাতীয় বন-নীতি অনুযায়ী দেশের মোট ভূ-সম্পদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বন হলে সব দিক থেকে মঙ্গল। সেখানে দক্ষিণ বঙ্গের দশটি জেলা মিলিয়ে মোট জঙ্গলের আয়তন মাত্র বারো ভাগ। আর যদি সুন্দরবনকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে ঝপ করে ওই হিসাব নেমে আসবে ছয় শতাংশে। এর ফল কি হয়েছে—বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, প্রচলিত ঋতুর সময় আর ঠিক থাকছে না। চাষবাস থেকে শুরু করে জনজীবনে নেমে আসছে বিপর্যয়। এই বিপর্যয় রোধ করা রাজ্যের অন্যান্য অংশে যখন তেমন সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাঘের নাম করে সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার একটা চেষ্টা চলছে। যদি ওই বন বাঁচে, তাহলে শুধু সুন্দরবনের বাইশ লাখ মানুষ নন, গোটা দক্ষিণবঙ্গের চার কোটি মানুষ বাঁচবেন—নইলে সব বন উজাড় হয়ে গেলে একদিন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে থর মরুভূমির আকস্মিক অনুপ্রবেশ নেহাৎ কষ্টকল্পনা নয়।

আর বিকল্প জীবিকার পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত জীবিকার সুস্থ অস্তিত্ব ওই বাঘ প্রকল্পই দেবে। গোটা সুন্দরবনে রেললাইন মাত্র ৪২ কিলোমিটার, রাস্তা ২৫৩ কিলোমিটার এবং জলপথ ২৮৯৬ কিলোমিটার। পূর্ব রেল এখন ৮২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ খোলা যায় কিনা ভাবছেন। যদি ওই প্রস্তাবিত লাইন গড়ে ওঠে, তাহলে বহু হাজার মানুষের অন্নসংস্থানের পথ হবে প্রশস্ত।

তাছাড়া ব্যাঘ্র প্রকল্পের গবেষণায় ধরা পড়েছে, সুন্দরবনের নদীনালায় ইলিশ সমেত কয়েক জাতের মাছের আমদানি বছর বছর কমে যাচ্ছে। গবেষকদের বক্তব্য: সারা বছর ধরে একই জায়গায় মাছ না ধরে যদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে করা যায়, তাহলে মাছের বংশবৃদ্ধির পথ হবে সুগম। এলো-পাথাড়ি গাছ কাটা রোধ করে পরিকল্পনা মাফিক কাটলে একদিকে কাঠুরেদের জীবিকা যেমন অটুট থাকবে, তেমনি অপরদিকে নতুন করে গজিয়ে উঠবে জঙ্গল।

মাত্র তিন বছরের পরীক্ষায় বন দপ্তর দেখিয়ে দিয়েছেন সারা দেশে ন'টি

ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে বাঘের সংখ্যায় সুন্দরবনের স্থান আজ শীর্ষে। প্রকল্পের সময় মোট ছ' বছর। যদি বাকি তিনটি বছর ওইভাবে কাটে, তাহলে সুন্দরবনের বাঘ যেমন খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকার সুযোগ পাবে, তেমনি পাবে মানুষজনও ক্রমবর্ধমান বনসম্পদের করুণা। আর এখনো যে-বিষয়টি সম্পর্কে সুন্দরবন অনিশ্চিত, তা হল পর্যটনের সুযোগ ও প্রসার। ওই বাঘ দেখিয়েই দিশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার, মার্ক, ইয়েন রোজগার করা সম্ভব। তার জন্য চাই উপযুক্ত লঞ্চ সার্ভিস, টুরিস্টদের থাকার হোটেল ও খাবারদাবার। সব কেন সরকার করবেন? এসব কাজ সব দেশেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবসায়ীরা এখনই এগিয়ে আসুন না। গোসাবা, নামখানা, বসিরহাট, সজনেখালিতে হোটেল খুলুন। লঞ্চ নামান জলে। বাঘ দেখার জন্য বনদপ্তর তো ওয়াচ টাওয়ার বানিয়েছেন, আরো বানাবেন। আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেখবেন লোকে দার্জিলিং, দীঘা ছেড়ে সুন্দরবনে ছুটছেন ছুটি কাটাতে—এরকম নদী, অত নিবিড় সবুজ জঙ্গল এবং স্বপ্নের মত সুন্দর ও ভয়ঙ্কর বাঘ আর কোথায় আছে?

সুন্দরবন ও অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্প

১৯৫২ সালের বাঘ সুমারির ফল দেখে সারা দেশে মোট ন'টি সরকার বিচলিত বোধ করেন। এই সময় বিশ্ব বন্য প্রাণীজঙ্গলকে আইনবলে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেন। ভাণ্ডার ছয় কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব দিয়ে এখানে ওই নটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম, ঠিকানা, আয়তন ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন দেশের সম্ভাব্য বাঘের কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ও ১৯৭৬ সালের আবাসগুলিকে নিরাপদভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা গণনা অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা দেওয়া হল :—

নাম	ঠিকানা	আয়তন	অর্থের পরিমাণ	বাঘের সংখ্যা
		বর্গ কিমি	লক্ষ টাকা	
১। করবেট পারক	ইউ পি	৫২৫	৩৬.১০	৫৫
২। মানস	আসাম	২৮৩৭	৪০.৯০	৪১

	নাম	ঠিকানা	আয়তন	অর্থের পরিমাণ	বাঘের সংখ্যা
			বর্গ কিমি	লক্ষ টাকা	
৩।	বন্দীপুর	কর্ণাটক	৬৮৯	৩৫.৬১	১৯
৪।	কানহা	মধ্যপ্রদেশ	১১০০	৪০ ৬০	৪৮
৫।	মেলঘাট	মহারাষ্ট্র	১৫৭২	৩৬ ৭১	৩২
৬।	রন্থমভোর	রাজস্থান	২৯৮	৩৫.০০	২০
৭।	পালামৌ	বিহার	৯০০	৩৫.৮০	৩০
৮।	সিমলিপাল	ওড়িশা	২৫০০	৩৮.৬২	৭৫
৯।	সুন্দরবন	পশ্চিমবঙ্গ	২৫৮৫	৩০ ৯২	১৮১

কোন দিন জঙ্গলে (বেতলা)

ভকিল সাহাব, আই অ্যাম হানড্রেড্ পারসেনট সিওর, উও ফাদার খুদ আপনি হাত সে ইয়ে বুঢ়া কাম কিয়া। ব্যস, ভকিল সাহাব তো চটেমটে লাল। একটার পর একটা প্রশ্ন, সে আর শেষই হয় না। ওদিকে জজ সাহেব ঘন ঘন হাই তুলছেন, যা গরম ডালটনগনজে, তাতে ঘুম পাওয়াটা দোষের কিছু না। ঘর ভরতি লোক। অর্ধেক ফরসেট ডিপারমেনটের, বাকি সব চারচের। বাইসন খুনের মামলা। আসামী স্বয়ং খ্রীস্ট ভক্ত ফাদার চাকো। ক্রিসমাসের সময় বেতলা ফরেসটে নিজের হাতে নাকি বন্দুক চালিয়ে শিশু বাইসনটাকে ফাদার খুন করেছেন। শিশু যীশুর জন্মোৎসবে মহাভোজের উপাচার সংগ্রহে নেমেছিলেন ফাদার। বাদ সেধেছে বেতলা জঙ্গলের দাঁতাল ফরেসট অফিসার বিয়াস সিং। সেই বাদ-বিবাদের মামলায় এখন ডালটনগঞ্জ বালির কড়াইয়ে চীনে বাদামের মত ফুটছে।

জেলা শহরের তাবৎ শংকর দাস ব্যানার্জি ফাদারের দিকে। তবুও লাভ হয়নি। আদালতের রায়—ফাদার অপরাধী, তাই ১৯৫২ সালের বন্য প্রাণী আইন অনুসারে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কিন্তু চারচ হাল ছাড়ার পাত্তরই নয়। হায়ার কোরটে অ্যাপীল করে ফাদারের হরিণবাড়ি গমন ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই গল্পই বিয়াস বলছিল। বেতলার একমাত্র গেছো-ঘরের বারান্দায় বসে তারার আলোয় মহুয়ার গন্ধে মাখামাখি সন্ধ্যার বাতাসে গা জিরোতে জিরোতে সেই গল্প শুনছিলাম। অল্পদিন হল বৈশাখ নেমেছে

এই পালামৌর জঙ্গলে। সিমুল, পলাশ, খয়ের গাছগুলো পুড়ে খাক হয়ে গেলেও আশ্চর্যভাবে সবুজ হয়ে আছে শাল, সেগুন, বহেড়া, আমলকী, কুসুম, ঝাউ, চিলবিল ও মহুয়ার অরণ্য। নাবাল জমিতে চিরো ও চুয়ানট ঘাসের ঠাস বুনোট আলপনা। মাটি ফেটে ফুটিফাটা। লাল ধুলো পায়ে পায়ে। রঁাচি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আজই দুপুরে একশ চার মাইল গরম বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে এই জঙ্গলে এসে পৌছেছি। এসে শুনি বিয়াস নেই। বিয়াস গেছে ডালটনগঞ্জ, অফিসের মামলা সামলাতে।

সে শোনে, সেই বলে পাগল। এই গরমে পালামৌ জঙ্গলে? সর্বনাশ, দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে যে। কেউ যায়! আর তাছাড়া এখন ওখানে দেখার আছেটা কি? জঙ্গলের জন্তুরাই এ সময় ঘর ছেড়ে বেরোয় না। লু বইছে। বরং যেতে হয় তো দার্জিলিং বা সিমলা ঘুরে এসো। বিহারের জঙ্গলে হাওয়ার মধুমাস অক্টোবরের পর। তখন টুরিস্টরাও যায়। তখন বাঘ ভালুকের সঙ্গে কলকাতার বালক বালিকাদেরও পাবে। যা বলছি শোন, পাগলামি করো না।

উপদেশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। নিশ্চিন্ত হলাম, তাহলে ভুল ডিসিশন নিইনি। রাত আটটায় হাওড়া থেকে হাতিয়া-রঁাচি এক্সপ্রেস ছাড়ে। সটান গিয়ে উঠে বসলাম ওই ট্রেনে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল কনডাক্টর গারডের বৈতালিকে—রঁাচি আসছে। আর বারো মিনিটের মধ্যে ট্রেনে পৌছে যাবে। আপার বারথে শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছি, ট্রেনটা হামাগুড়ি দিয়ে গুটি গুটি চড়াই ভাঙ্গছে। ভোর রাতেই মুড়ি জংশন আমরা ছেড়ে এসেছি।

বিয়াস নেই। বেতলা রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসও খা খা করছে! পিচ বাঁধানো রাস্তার বাঁ ধারে একতলা খান কয়েক বাড়ি। বন দফতরের ছোট বড় অফিসারদের অফিস কাম কোয়ার্টার। ইষৎ দূরে শ' খানেক ফুট উঁচু টিলার ওপর ডি এফ ও সাহেবের বাড়িটা নীল আকাশের বুকে ছবি হয়ে আছে। ডান হাতে টুরিস্ট লজ ও এই ট্রি হাউস। মধ্যবয়সী মহুয়া গাছের গুঁড়িটা কলকাতার টাউন হলের থামের মত ফুট ত্রিশেক ওপরে উঠে চারদিকে ডালপালায় ছড়িয়ে দিয়েছে। ওই গাঁটের মুখে বাঁশ ও বেত দিয়ে বানানো এই ডবলবেডের গেছো ঘর। সামনে ঘোরানো ঝুল বারান্দা। পাশেই অ্যাটাচড প্রিভি। বেসিনে মুখ ধুয়ে আয়নায় একবার নিজের রোদে পোড়া পুরোনো মুখটা দেখে দিলাম। কপালে, দুই গালের ওপরে, চোখের নীচে কালো কালো ছোপ।

অনেক খুঁজে পেতে ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিসের দাওয়ায় দুটি লোককে পেলাম। জলপাই রংয়ের মোটা কাপড়ের উর্দি গায়ে হাঁপাচ্ছে। আমরা জঙ্গলের ভেতরে খেড় ডাকবাংলো দিন কয়েকের জন্য বুক করতে চাই শুনে ওদেরই একজন খোনা গলায় বলল, সিংজী তো নেই। বিয়াস সিং ছাড়া এখানে আর কেউ পারমিশন দিতে পারবে না। ডালটনগঞ্জে ফরেস্ট অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে। খেড় বেতলা থেকে আরো আট কিলোমিটার জঙ্গলের ভেতরে। বেতলা-মহুয়াদাঁড় রাস্তার ধারে। সরকারী অফিসাররা ছাড়া সাধারণত ওই বাংলোয় কেউ যায় না। বেতলার পর জঙ্গলে টুরিস্টদের ঢোকা নিষিদ্ধ। সঙ্গী বন্ধু নির্মল সাহার মুখেই খেড়ের কথা শুনেছিলাম। গত মার্চে হোলির সময় ওই বাংলোয় কটা দিন কাটিয়েও গিয়েছে। গভীর রাতে চিতল হরিণ আসে বাংলোর হাতায় বহেড়া গাছের ফল খেতে। বাইসন ভর দুপুরে গম্ভীর মুখে রাস্তা পেরিয়ে বাঁশ-বুরাশের জঙ্গলে ছায়া খুঁজে ফেরে। দূরে ছিপদহ রেল গুমটির অপর পাড়ে খয়ের, কুসুম, শালের জঙ্গলে, নালার ধারে ঘুর ঘুর করে সম্বর, বুনো শুয়োর, ময়ূর আর জঙ্গলের আবর্জনা জংলী কুকুর। কপাল ভাল হলে বড়া জানোয়ারের সঙ্গেও নাকি দেখা হয়ে যেতে পারে। কখনো-সখনো ভালুকও বেরোয়।

বিয়াস হাতের চার ব্যাটারীর টর্চটা দূরের শাল জঙ্গলের ওপর ফেলল। অসংখ্য হীরের কুচি একসঙ্গে জ্বলছে। চিতলের পাল বেরিয়েছে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কচি চুরানট ঘাসে মুখের স্বাদ বদলাতে। টর্চের আলোয় মুগ্ধ চিতলের চোখ খনির অন্ধকারে যেন মণি। বিয়াস জাতে রাজপুত। প্রায় ছ ফিটের কাছাকাছি। পোড়া তামাটে কুঁদেকাটা মুখের ওপর রাণা প্রতাপের গোঁফ জোড়ায় এই আটত্রিশ বছরেই বয়সের পা পড়েছে। জুলপিতে, মাথা ভরতি কালো চুলের রাশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বয়স। প্রচণ্ড স্বাস্থ্য। ঢোলা পা ট্রাউজারসের ওপর হাওয়াই শার্টার বোতাম সব কটা খোলা। মহুয়া গাছের ঘরের বারান্দায় বসে বৃক্ষ রসে সিক্ত হতে হতে বিয়াস বলল, ভকিল সাহাব নাছোড়বান্দা। প্রমাণ করবেনই যে ফাদার চাকো নিরপরাধ। কিন্তু নির্মল তুমি তো জানো জঙ্গলের জন্তু আমার কলজে। একটা বাইসন তুমি খুন করবে আর আমি তোমায় ছেড়ে দেবো। কবভি নেহি।

ফাদার চাকো দুজন চেরো আদিবাসী খ্রীশ্চানকে নিয়ে বেতলার ভেতর দিয়ে শর্টকাটে বারোয়াদি যাচ্ছিলেন। আজ তোমাদের জঙ্গলের যে প্রান্ত থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম, তার ঠিক ওপাশেই বারোয়াদি। সপ্তাহে দুদিন

হাট বসে। ফাদার যাচ্ছিলেন হাটে। বিকেল বিকেল। নালার ধারে বাইসনের যূথ চরছিল। একটা বাচ্চা কি করে ছিটকে নালার অপর পাড়ে চলে যায়। ফাদার লোভ সামলাতে পারেন নি। জোব্বার ভেতরে কেরালী ফাদার একটা রিভলবার ক্যারি করেন। বেমক্কা সুযোগ পেয়ে একেবারে পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেনজ থেকে বাচ্চাটার কপাল ফুটো করে দিলেন। কাজ তো হাসিল হল, এখন বামাল সরাবেন কি করে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এরপর টুরিস্টদের নিয়ে বন দফতরের কর্মীরা জিপে চড়ে স্পট লাইট দিয়ে জঙ্গল দেখাতে বেরিয়ে পড়বেন। তাই তিনজনে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে একটা খয়ের গাছের নীচে বাইসনটাকে মরা খয়ের পাতা দিয়ে ঢেকে কেটে পড়লেন। পরদিন সকালে এসে বাকি কাজটা হাসিল করবেন এই মতলব।

বিয়াস নেই শুনে, আবার আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম। ড্রাইভার ফলিন্দর প্রসাদ ঝিমোচ্ছিল। ডালটনগনজ যেতে হবে শুনে যেন একটু চমকে উঠল। সেই সকাল থেকে গাড়ি ছুটছে। বাতাসে বিহারী লু। আবার ছুটতে হবে এই দুপুরে। রাঁচি শহরে কারবালা ট্যাঙ্ক রোডের বস্তি থেকে প্রসাদকে জোগাড় করা হয়েছে। গাড়ির মালিক আদিত্য হাজরা থাকেন শহরের অন্যপ্রান্তে লালপুরায়। দেশ একদা ছিল পূর্ববঙ্গে। গত বিশ বছর রাঁচিতে। ব্যবসা ট্রান্সপোরটের। ছোট ভাই অন্য সওয়ারী নিয়ে ধানবাদ চলে গিয়েছে। তাই দাদা নিজে আমাদের নিয়ে বেরোলেন ড্রাইভার খুঁজতে। সাত দিনের কড়ারে ভাড়া নিচ্ছি, তাই একজন কড়া ড্রাইভার চাই, ধকল যাতে সামলাতে পারে। গাঁড়ির ব্যাটারীটার আবার মৃগীরোগ। ক্ষণে অক্ষণে ডাউন হয়ে যায়।

চেক-কাটা টেরিকটের প্যাণ্টের ওপর সুতীর চকরা বকরা হাওয়াই শারটের নীচে প্রসাদ মেদ মাংসহীন। তোবড়ানো গালে তিন-চার দিনের বাসী কাঁচা পাকা দাড়ি গড়ের মাঠ হয়ে আছে। পালামৌ জঙ্গলের নিষ্পত্র পলাশ গাছের মত মাথার চাঁদিটা ইষৎ কালচে। আদিত্যবাবু ডাকতেই একটা লুঙ্গি হাতে বেরিয়ে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল। মুখে কোন কথা নেই। ঘরে সাতটা মুখ হাঁ করে আছে। বয়স ত্রিশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে। এক সময় ডাল্টনগঞ্জ থেকে টিটাগড়ে পেপার মিলের জন্য বাঁশ নিয়ে যেত ট্রাকে। ডান চোখটায় পাথর লাগানোর পর ট্রাক চালানো ছেড়ে দিয়ে টুরিস্ট বোঝাই ট্যাক্সি চালায়। রাত্রিবেলা ঠাহর করতে না পেরে ট্রাকটা একটা কালভারটে তুলে দিয়েছিল। চারটে পাঁজর আর একটা চোখ জন্মের শোধ জমা দিয়ে

চার মাস হাসপাতালে পড়ে ছিল। ওর পুরোনো মনিব এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেয়নি! স্টারট দেওয়ার আগে নীচু গলায় শুধু বলল: এ সময় বিহারের সব শহরে অফিস সকালে বসে, বেলা বারোটায় ছুটি হয়ে যায়।

ঘড়িতে দেখলাম দুপুর দুটো। আটাশ মাইল ঠ্যাঙ্গাতে হবে। ভরসা দিল নির্মল, রাস্তা তো একটাই। যদি বিয়াস অফিসে না থাকে তো বেতলায় ফিরবেই। পথেই দেখা হয়ে যাবে।

অক্ষরে অক্ষরে ওর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল। ডালটনগঞ্জ শহরে ঢোকার মুখেই দেখি ফরেসট ডিপারটমেনটের উলকি আঁকা একটা জিপ উলটো মুখে তেড়ে আসছে। থামাও প্রসাদ থামাও। গাড়ি ছেড়ে দুজনে পিচ রাস্তায় নেমে এলাম। ততক্ষণে জিপের ভেতর থেকে নেমে এসেছে রাজপুত।

তিনশ বছর আগে আওরঙ্গজেবের আমলে বিয়াসের পূর্বপুরুষ ইজ্জৎ বাঁচাতে রাজস্থান ছেড়ে চলে এসেছিল বিহারে। সিমেণ্ট শহর জাপলাই ওদের এখন দেশ। ছেষট্টি সালে বি এস সি পাশ করে বন দফতরে ঢুকেছিল। ফরেস্ট রেনজার। তারপর পরীক্ষা, ট্রেনিং আবার পরীক্ষা দিতে দিতে এখন হয়েছে বেতলার ওয়াইলড লাইফ ওয়ারডেন। গিন্নী জানকীকুমারী দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলেকে নিয়ে সত্তর মাইল দূরে জাপলায় থাকেন। ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে বিয়াস পড়ে থাকে এই জঙ্গলে, বেতলায়। একতলা নীচু বাংলো ওই কোয়ারটারে।

খেড়ের ডাকবাংলোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। টুরিস্ট লজে মুরগীর ঝোল দিয়ে ভাত। তারপর বন দফতরের জিপে চড়ে বেরোলাম রিজারভ ফরেসটের চেহারাটা দেখতে। পিচ বাঁধানো রাস্তা একে-বেঁকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দূরে বহুদূরে চলে গিয়েছে। যাতে টুরিস্টদের কোন অসুবিধা না হয়। রাস্তা থেকে দু-ধারে প্রায় পঁচিশ ফুট করে জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে গাড়ি থেকেই তাদের দেখা যায়। বিয়াসের হাতে স্পটলাইট। দূরে শাল জঙ্গলের পেছনে বেতলা পাহাড়ের মাথায় সূর্য ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বাতাসও সবুজ শাল ও সেগুনের গন্ধ মেখে আস্তে আস্তে ভারী হয়ে উঠছে। দলে দলে চিতল সম্বর, বাইসন জঙ্গল ছেড়ে উঠে আসছে রাস্তার দু-ধারে চুরানট ঘাসের মাঠে। মরা খয়ের পাতা মাড়াতে মাড়াতে জিপ ছুটছে।

রাত্রিবেলা আফিসে বসে কাজ করছিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল এক ফরেস্ট গারড। পাহারাদারী সেরে ঘরে ফিরছিল। এমন সময় খয়ের গাছের নীচে হঠাৎ একটা ঢিবি মত দেখে একটু বিস্মিত হল—পাতা দিয়ে

ঢাকা। কি ব্যাপার? সকালে তো ওখানে কোন ঢিবি ছিল না। হাতের টাঙ্গিটা ওই ঢিবির মাথায় বুলোতেই মরা পাতাগুলো সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল মরা বাইসন।

তক্ষুনি জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ওই ফরেস্ট গারড আর এই রিভলবার। টেবিলের ওপর ওর খাপ খোলা রিভলবারটা গ্লাস ও জলের মগের পাশে পড়েছিল। বসে রইলাম সারা রাত ওই মৃত বাইসনের পাশে। টরচের আলোয় দেখলাম কপালে গুলির গর্ত। জানতাম যে বা যারা এ কাজ করেছে, তারা ভোর হলেই আসবে পাচার করতে।

তখনো সূর্য ওঠেনি। কুসুম কুসুম আলো জঙ্গলের মাথায় মাথায়। সারা রাত জেগে একটু ঢুলুনি এসেছিল। এমন সময় রাস্তায় মরা পাতার ওপর মচ মচ আওয়াজ শুনে চটকা ভেঙ্গে গেল। কারা যেন আসছে? তাড়াতাড়ি ফরেস্ট গারডকে সঙ্গে নিয়ে খয়ের গাছটার পেছনে নালায় নেমে গেলাম। ঘাসের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দেখতে পাচ্ছি দুজন চেরো মরদ এদিকে আসছে। খালি গা, কোমরে লেংটি। হাতে ছুরি। সামনে পিছনে তাকাতে তাকাতে। চোখে মুখে ভয়, সন্দেহ। ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। ওরা এল। বাইসনটার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। যেন বুঝতে পারল ওরা যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, সে অবস্থা আর নেই। মরা পাতার ঢিবি হাঁ হয়ে আছে। দুজনে নিজেদের মধ্যে কি বলল, শুনতে পেলাম না। মনে হল একজন যেন তক্ষুনি পালাতে চাইছে, অন্য জনের তাতে সায় নেই। দ্বিতীয় মরদটি ছুরি নিয়ে তক্ষুনি বসে গেল। ঝপাঝপ হাত চালাচ্ছে। প্রথম জন নজর রাখছে। আস্তে উঠে এলাম। হাতে পয়েনটি থ্রি নট এইট রিভলবার। আঙ্গুল ট্রিগারে। আমাকে দেখেই যেন ভূত দেখল। যে ব্যাটা ছাল ছাড়াচ্ছিল সে আর ওঠার চেষ্টা করল না, ওই বাইসনের পাশেই শুয়ে পড়ে কান্না জুড়ে দিল। আর নজরদার লাফ দিয়ে রাস্তায় উঠে এসে চীৎকার করে বললাম, থাম। যদি না থামিস তো এই রাজপুতের গুলি তোর পা একেবারে জখম করে দেবে। পাছে মনে করে ফাঁকা বুলি, তাই দু রাউণ্ড ওর মাথার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিলাম। তাতেই কাজ হল। ধরা পড়ার পর সব কবুল করল। বলল, বারোয়ানি হাটের কাছে চারচের ভ্যাল নিয়ে ফাদার অপেক্ষা করছেন। বলে দিয়েছেন ছাল-ফাল ছাড়িয়ে শুধু মাল নিয়ে যেতে। দুই ব্যাটাকে জিপে তুলে তখনই ছুটে গেলাম বারোয়ারিতে। গিয়ে দেখি ফাদার চাকো ভ্যানটাকে রাস্তার ওপর রেখে হাতঘড়িতে সময় দেখছেন। হঠাৎ জিপের ভেতর ওই চেরো

মরদ ছুটোকে দেখেই ফাদারের সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন ভ্যানের দিকে। হাটবার। হাটের চালাগুলো রাস্তার দু ধারে। আমিও জিপ থেকে নেমে পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম। চালাগুলোর পাশ কাটিয়ে যখন গিয়ে পৌছুলাম ততক্ষণে ভ্যানটা স্টারট নিয়ে নিয়েছে। ধরতে পারলাম না।

ভকিল সাহাব ছাড়েন না। জজের সামনেই চেপে ধরলেন আমাকে : ফরেস্ট রেনজারের পরীক্ষায় বসতে হলে তো আগে ষোল মাইল দৌড়ের পরীক্ষায় পাশ করতে হয় ?

বুঝলাম জঙ্গলের আইন ভকিল সাহেব-এর মুখস্থ। বললাম : ট্রেনিং পিরিয়ডে আরো দু দফা ন মাইল দৌড়ের পরীক্ষা দিতে হয়।

—তাহলে ফাদার চাকোকে ধরতে পারলেন না কেন ?

—আমি তো পৃথিবীর ফাসটেস্ট রানার নই। অলিম্পিকে পাঠালে ফাদার চাকো নিশ্চয় ইনডিয়ার জন্য একটা গোল্ড মেডেল আনতে পারতেন।

গল্পে গল্পে রাত বেড়ে গিয়াছে। এই রাতে আরো আট কিলোমিটার দূরে আমাদের যেতে হবে। জানি না সে ডাকবাংলো কি রকম ? তার চৌকিদার কি ভাবে এত রাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে ? আদৌ জানাবে তো ? অবিশ্যি নির্মলের মুখে শুনে শুনে মনে হয়েছে ওই ডাকবাংলার ইঁটগুলোর রোমাঞ্চ, কড়ি বরগার রহস্য—জ্যোৎস্না রাতে হরিণ ডাক দিয়ে যায়, জাকারাণ্ডার বেগুনী ফুল ফুরফুরে হাওয়ায় দোলে, খয়েরের গন্ধে মহুয়ার ফুলে বাতাস উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বিয়াস হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, চল একটা ফোরট তোমাদের দেখিয়ে আনি।

[২]

অন্ধকারেও টের পাচ্ছি গাড়ি কখনো এঁকেবেঁকে ওপরে উঠছে, কখনো নামছে নীচে। দু'ধারে গার্ড অব অনার দিচ্ছে ঝুপসি গাছের সারি। এই রাতে তারার আলোয় অরণ্য কেমন ছায়া-ছায়া। চাপা একটা আলোর আভা আকাশে। বোধহয় খানিক বাদেই চাঁদ উঠবে। প্রাক্তন ট্রাক ড্রাইভার প্রসাদ অতীতে বহুদিন বহুরাত এই পথ দিয়েই কাগজ-কলের খাদ্য বাঁশ গাড়ি-বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছে। রাস্তা মুখস্থ। একটা তো পাথরের, অন্যটা ঘুমোচ্ছে কিনা কে জানে, পেছন থেকে প্রসাদের মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছি না।

এখন রাত এগারোটা। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আজ রাতে আর দুর্গ দেখতে গেলাম না। কাল দেখব বলে বিয়াসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। কিন্তু কালও সন্ধ্যার আগে বিয়াসের সময় হবে না। ডালটনগঞ্জে যাবে। তাই সই। স্পট লাইট আর টর্চের আলো তো আছে। আর যদি সাঁঝ-সকালেই কাল চাঁদ ওঠে, তাহলে তো কোন কথাই নেই।

চুপচাপ পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে নির্মল এতক্ষণ টর্চটা পরীক্ষা করছে। কখনো জ্বালাচ্ছে। এবার মুখ খুলল : ধর যদি গিয়ে দেখি আর কেউ অলরেডি বুক করে বসে আছে।

—কেন তুই বুকিং-এর আগে চার্ট দেখে নিসনি ?

—নিয়েছি বলেই তো বললাম। বিহার গভর্নমেন্টের একজন অফিসার ফ্যামিলি নিয়ে উঠেছেন। আজ রাত আটটায় ওদের চলে যাওয়ার কথা। আমাদের বুকিং রাত আটটার পর।

ক্লান্তি-ফান্তি সব উবে গেল। সোজা উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি রাত হয়ে গিয়েছে বলে ভদ্রলোক ঘর না ছাড়েন, তাহলে ?

পরম নিশ্চিন্তে সিটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলল, তাহলে রাতটা এই গাড়িতেই কাটাতে হবে। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ পড়তে পারছি না। পাশাপাশি ছায়ামূর্তির মত বসে। নির্মলের ব্যায়ামপুষ্ট ছ' ফুট বাই সাড়ে তিন ফুট দেহটা পেছনের লম্বা আসনের আধখানার বেশি দখল করে আছে। আর্য মুখখানার ওপর একরাশ ক্লান্তি চুল ঝুলছে। পরনে ওর নিজস্ব ডিজাইনের নীল জিন্সের সাফারি স্যুট। সামনের সিটে প্রসাদের বাঁদিকে আমাদের সর্বস্ব দুটি কিট ব্যাগে গচ্ছিত। পাজামা, তোয়ালে, টুথপেস্ট ও ব্রাশ আর বাড়তি একজোড়া জামাকাপড় ছাড়াও শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আসার সময় নির্মল দু' ডজন মেক্সাফরম, দু ডন ডাইজিন ও এক ডজন কোডোপাইরিন নিয়ে এসেছে। আপাতত ওষুধগুলো একটা কাগজের বাক্সে বন্দী অবস্থায় ওর কিট্ ব্যাগের কোণে পড়ে রয়েছে। বেড়াতে বেড়িয়ে কোনরকম রিস্ক নেওয়া নির্মলের পছন্দ নয়। গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে টার্ন নিয়ে শ'খানেক গজ হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে একটা গেটের সামনে থামল। দুদিকে তারকাঁটার বেড়া। প্রসাদ ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে।

মিনিট দুই কেটে গেল। গেট আর কেউ খোলে না। শেষ পর্যন্ত নির্মল নেমে গেল। তালা-ফালার কোন ব্যাপার নেই, স্রেফ ভেজানো ছিল। কাঠের গেটটা হাট করে খুলে দিল। কিন্তু ততক্ষণে বারোটা যা বাজার বেজে গিয়েছে।

গাড়ি আর স্টার্ট নেয় না। ব্যাটারী ডাউন। প্রসাদ হ্যাণ্ডেল মারতেই ব্যাটারীর মৃগীরোগ সেরে গেল। ধোঁয়া ও গর্জন ছাড়তে ছাড়তে অ্যাম্বাসাডারটা ধুঁকতে ধুঁকতে এগুতে লাগল। চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। বাঁদিকে একতলা বাংলো বাড়ি। দেওয়াল সাদা। ডানদিকে ছোট ছোট খানকয়েক একচালা। মাঝখানে বিরাট চত্বর। একটা গাড়ি এই চত্বরের মাঝখানে ঘুমুচ্ছে। প্রসাদ ওই গাড়িটার পাশে নিয়ে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করাল।

ভোঁ-ভোঁ—কেউ নেই। অভ্যর্থনা তো দূরের কথা, বেমক্কা কোথা থেকে গোটা-দুই দিশী কুকুর চীৎকারে আকাশ ফাটাতে শুরু করল। ডাকবাংলোর বারান্দার ওধারে ঘরটার একটা ম্যাটমেটে আলো। ভেতরে ঢুকে দেখি একটা ডাইনিং টেবিলের ওপর একটা হ্যারিকেন, টেবিলের চারধারে কয়েকটা ভীত মুখ। অধিকাংশই কিশোরী ও মহিলা, শুধু একজনের ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু আশুতোষী গোঁফ। নির্মল ওই স্যার আশুতোষকেই জিজ্ঞাসা করল: চৌকিদার রামদাস কোথায় বলতে পারেন?

কেউ কোন জবাব দেয় না। যেন দুটো ভূত সামনে দাঁড়িয়ে। বারকয়েক একই প্রশ্ন রিপিট করার পর স্যার আশুতোষ তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে অনেক কষ্টে বললেন, লাস্ট রামদাসকে দেখা গিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা। ডাকবাংলোর রেজিস্ট্রি-খাতাটা নিয়ে এসেছিল সই করাতে। তা রাত হয়ে যাওয়ার জন্য ওরা আজ যাওয়া পোস্টপণ্ড করে দিয়েছেন। সেই যে রামদাস উধাও হয়েছে আর পাত্তা নেই। রাতের ডিনার পর্যন্ত জোটেনি।

সঙ্গে সঙ্গে কেসটা টেক-আপ করল নির্মল। বলল, চ, খুঁজে দেখি।

বেশি খুঁজতে হল না, ডাকবাংলোর পেছনে মহুয়া গাছের নীচেই খুঁজে পাওয়া গেল হাফ-প্যাণ্ট, সাদা হাত-হাতা গেঞ্জি, পাশে একটা খালি বোতল—সাড়ে চার ফুট রামদাস সর্বাঙ্গ অন্ধকারে ডুবিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। টর্চের আলো চোখে পড়তেই ল্যাপা-পোঁছা মুখের ওপর বাঁ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে উঠল। আধখোলা এক চোখে আগন্তুকদের সাইজ আঁচ করছে রামদাস। নির্মল একটা দশ টাকার নোট দিয়ে টর্চের মুখটা ঢেকে দিল। আধা অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি চৌকিদারের বাঁ চোখটা পুরোপুরি খুলল। তারপর ডান চোখ। সবশেষে পুরু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

বুকিং স্লিপ দেখল কি দেখল না, সগর্জন ঘোষণা উচ্চারিত হল—ঘর দিতেই হবে। রাত আটটায় ওদের বুকিং শেষ হয়ে গিয়েছে। আইনত একটা ঘর এখন আমাদেরই প্রাপ্য।

পাটনাই অফিসারকে ধমকে ডাইনিং হলের বাঁ ধারের ঘরটায় সপরিবারে পুরে দিয়ে তবে ছাড়ল রামদাস। ডান হাতি ঘরটা পেলাম আমরা। আধঘণ্টার মধ্যে ডিনার এসে গেল—গরম মুরগীর মাংস আর হাতেগড়া রুটি। কি করে সম্ভব হল? নির্মল খাটো গলায় বলল: স্যার আশুতোষ যেটা অরডার দিয়েছিলেন সন্ধ্যেবেলা, সেটাই এখন আমাদের সারভ করল। তিনদিন ধরে ব্রেক ফাস্ট, লান্চ, টি, ডিনার স্নানের জল, গাড়ি ধোয়া পাগলা করে করে রামদাস যে পরিমাণ বখশিশ আশা করেছিল, তার সিকির সিকিও ঠেকান নি স্যার আশুতোষ। তাই সন্ধ্যাবেলা নিট একটা পাঁইট মহুয়া টেনে ফ্ল্যাট হয়ে পড়েছিল। ওদিকে সেয়ানা—তুমি যতবড়ই অফিসার হও না কেন আদিবাসী কর্মচারীর গায়ে হাত দিলেই পাহাড়ে দাবানল লেগে যাবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে ডবল খাটের একটায় টান টান হয়ে পডতেই দেখি মুখশুদ্ধির মত দুটো ডাইজিন বড়ি গালে ফেলে নির্মল ডাইনিং হলের দিকে পা বাড়াল। হাতে টর্চ। শরীর আর মানছে না, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে গাড়ির আওয়াজ। স্টার্ট নিচ্ছে। নির্মল ঘরে নেই। পাগলা কি এই রাতেই গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছে? তাডাতাড়ি বিছানা ছেডে নামলাম। ডাইনিং হল ফাঁকা। হ্যারিকেনটা নিভু নিভু। ওপাশের ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় গিয়ে দেখি নির্মল কাকে যেন হাত নাড়ছে, আর বলছে, ফির মিলেঙে। আর ডাকবাংলোর চত্বওে আমাদের গাড়ির প্াশেই দ্বিতীয় গাড়িটা হেড লাইট জ্বেলে গর গর করছে। স্টিয়ারিংয়ে স্যার আশুতোষ। রীতিমত গম্ভীর মুখে। গাড়িটা চলে গেল।

—কি হল রে? এত রাতে ওরা চলে গেল?

—না গিয়ে কী উপায় বল। তিনটে জ্যান্ত ভূতের গপ্পোর পর এই ডাকবাংলো তো মূর্তিমান বিভীষিকা। তাছাড়া ওরা যে ঘরটায় ছিল এই সেদিন হোলির সময় কড়িকাঠে ধুতি ঝুলিয়ে আত্মহত্যার ডিটেলড বর্ণনা শোনার পর স্যার আশুতোষের স্ত্রী-কন্যারা স্ট্রেইট জেহাদ ঘোষণা করল, আর এক মিনিটও নয়। চল এবার ওই ঘরটাও আমরা দখল করি।

আম, মহুয়া, বহেড়া গাছ দিয়ে ঘেরা এই ডাকবাংলো। ছোট একটা টিলার ওপর। উঁচু ভিতের গায়ে সাঁটা সাদা মারবেল পাথরের ওপর কালো অক্ষরে খোদাই করা—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১·২৫ ফুট উঁচুতে এই বাংলো। বারান্দার সিঁড়ির দু ধারে দুটি ঝুলন্ত নয়নতারা গাছ। খানিক দূরে তারকাঁটার বেড়ার ওধারে একটা ট্রেলার ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানের পেছনে একতলা

টালি ছাওয়া একটা কোঠাবাড়ি। ভোরবেলা রামদাস চা দিতে এসে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই ঘুম কেটে গেল। বিছানায় পড়ে থাকতে আর ইচ্ছে কর[illegible] না। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে চারপাশ দেখছিলাম। পিচ বাঁধানো রাস্তাটা দূরে জঙ্গলের ভেতর পাক খেতে খেতে নেমে গিয়েছে। টিলার নীচেই খয়ের জঙ্গলের ভেতর একটা ইঁদারার সামনে সাতসকালেই কলসীর লাইন পড়ে গিয়েছে। চেরো, ওঁরাও রমণীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ডাক বাংলোর দক্ষিণে তারকাটার বেড়ার ধার ঘেঁষে শুরু হয়ে গিয়েছে চেরো গ্রাম। রামদাস দ্বিতীয় কাপ চা ঢালছে। নির্মল এখনো ওঠে নি। জিজ্ঞাসা করলাম, চৌকিদার ওই ট্রেলার ভ্যান আর কোটটা কার ?

রামদাসের জবাব রীতিমত বিস্ময়কর! ভ্যানগাড়ি ও কোঠাবাড়ির মালিক কলকাতার এক মেম সাহেব। নাম তার অ্যান রাইট। শ্রীমতী রাইটকে আমি চিনি। ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের সদস্য, বন্যপ্রাণী প্রেমিক। রামদাসের জবানীতে—কলকাতা থেকে মেমসাহেব দলে দলে বিলহিতি টুরিস্ট নিয়ে আসেন এই জঙ্গলে শের, ভালু দেখাতে। মাথা পিছু পাঁচ হাজার টাকা। অতিথিদের সাময়িক বাসস্থান ওই কোটা। ভ্যানগাড়িটা রথ। কখনো বেতলায়, কখনো মধ্যপ্রদেশের কানহায় নিয়ে যান বিদেশীদের। ফলাও কারবার।

এই কারবারের কথাই গত রাতে বলছিল বিয়াস। ৯৩৬ বর্গ কিলোমিটার জোড়া এই রিজারভ ফরেস্টে বাঘই আছে চল্লিশটি। বাইসন ৫০০, সম্বর ৫০০, চিতল হরিণ ১৯০০০, বুনো শুয়োর ১৬০০০, চিতাবাঘ ২০০, বুনো হাতি ৩৮, নীলগাই ৭৫, জংলী কুকুর ১০০, নেকড়ে ৫০, বারকিং ডিয়ার ২০০, ভালুক ১০০ আর অগুনতি ময়াল। গাছে, মাটিতে, গুহায় সর্বত্র ময়াল। আর এই অসামান্য বনসম্পদ দেখতে প্রতি বছরই হাজার হাজার টুরিস্ট আসে এই জঙ্গলে। গত বছর টুরিস্ট এসেছিল প্রায় বিশ হাজার। ফিসার মেনসন করে গোঁফ চুমরে বিয়াস বলল, এর মধ্যে পনেরো হাজারই কলকাতার বাঙালী। তোমরাই তো জঙ্গল ভালোবাসো। তোমাদের দেখিয়ে সুখ ও পয়সা দুই পাওয়া যায়।

—কি রকম ?

—একটা হিসাব দিলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই বিশাল জঙ্গলটা চারটে রেঞ্জে ভাগ করা—চেতলা, ছিপাদাহ গারু ও বারেষাঁড়। এই বেতলা রেঞ্জের জন্য বছরে খরচ যেখানে এক লাখ ষাট হাজার টাকা সেখানে টুরিস্ট খাতে আয় আড়াই লাখ টাকা। আর এই যে গেছো-ঘরে বসে আছো এটা বানাতে

খরচ পড়েছিল সাড়ে চোদ্দ হাজার টাকা। এক বছরেই উঠে এসেছে সাড়ে ছ হাজার টাকা। আর এই আয়ের আশী থেকে পঁচাশী ভাগ তো তোমরাই জোগাচ্ছ।

স্ব-রাজ্যে কলকাতার গায়েই পড়ে রয়েছে অত বড় সুন্দরবন। টাইগার প্রজেক্ট। সারা দেশে আর কোন টাইগার প্রজেক্টে অত বাঘ নেই যেত আছে সুন্দরবনে, প্রায় দুশটি। আছে বারো থেকে পনেরো হাজার চিতল হরিণ। অসংখ্য বুনো শুয়োর ও বানর। লক্ষ লক্ষ পাখী। জলে অজস্র মাছ ও কুমীর। সর্বোপরি দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়ানো নদী, মাঝে মাঝে গরাণ, গেঁউয়া, বর্জন, ধুঁধুল, হেঁতালে সবুজ দ্বীপ। আর সব জঙ্গলে পায়ে হেঁটে, গাড়িতে চড়ে ঘোরা সম্ভব। জীবজন্তু খুন করে, বে-আইনীভাবে কাঠ কেটে রাতারাতি ট্রাকে তুলে পালানো কিচ্ছু না—একেবারে জলভাত। সুন্দরবনে সে পথ বন্ধ। লঞ্চ বা নৌকো ছাড়া ঢোকাই যাবে না। লঞ্চের মালিক স্বয়ং সরকার বাহাদুর। প্রাইভেট লঞ্চ লোকালয়ে যাত্রী পারপার করে। ভুলেও মধু, কাঠ বা হরিণমারাদের দলে ভিড়ে দু আড়াই লাখ টাকার লঞ্চ খোয়াতে কোন লঞ্চ মালিক রাজি হবে না। ফলে সরকারী অনুমতি ও সাহায্য ছাড়া কোন টুরিস্টের সাধ্য নেই যে সুন্দরবনে ঢোকে। গত পাঁচ বছরে ওই জঙ্গলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পায় ত্রিশ লাখ টাকা খরচ করেছেন। টাকাটা দিয়েছে দিল্লী। পাঁচ পাঁচটা ওয়াচ টাওয়ার গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দ্বীপে। ওইসব টাওয়ারে এসে ক্যাজুয়ালি রয়েল বেঙ্গল দেখা যায়। যেকোন, স্বদেশী বা বিদেশী টুরিস্ট ওই বাঘ দেখার স্বাদ পাওয়ার জন্য শয়ে শয়ে টাকা ব্যয়ে মুখিয়ে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকারের শুচিবাইগ্রস্ত বন দফতরের চোখে টুরিস্ট মানেই অশুচি। উদ্বাস্তুরা ঢুকে জঙ্গল সাফ করে দিলেন। মন্ত্রীরা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, গেল গেল, জঙ্গল গেল। তবু ভুলেও তারা ওই জঙ্গলে একটিও টুরিস্টকে ঢুকতে দেন নি, দেবেনও না। ধনভাঙা পণ। সম্ভবত অনুমতি দিলে সুন্দরবনের জাত যাবে। বেতলায় এসে দেখছি জাত যায় নি বরং দুটো পয়সার মুখ দেখে বেতলা এখন পাটনার চোখে জাতে উঠেছে।

খয়ের, শিমূল, পলাশ পোড়ানো দুপুরে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চললাম ছিপাদহ রেল গুমটির দিকে। খেড় থেকে প্রায় পাঁচ মাইল। সঙ্গে সঙ্গী খেড়ের দুই ফরেস্ট গারড তুলসী মাহাতো আর ভগবান রাম। জলপাই রংয়ের ফুলপ্যান্টের ওপর একই রংয়ের শার্ট পরেছে রাম। মাহাতো হাফপ্যান্টের

ওপর চড়িয়েছে একটা হাফ শার্ট, হাতে টাঙ্গি। বিকেলের মুখেই এসে পড়লাম রেল গুমটিতে। রেললাইন ধরে হাঁটছি। দু ধারে ঘন জঙ্গল। লাইনের ধারে ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অর্ধদগ্ধ শাল ও সেগুন। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লার কারসাজি। দুরন্ত গরমে শুকনো আগাছার জঙ্গলে ছিটকে পড়ে যে আগুন জ্বালায় তারই পরশমণির ছোঁয়ায় প্রাণ হারায় প্রাণবন্ত সবল সব বৃক্ষ। ওই অরণ্য-শ্মশানের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। খানিক বাদেই আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল শুকনো বালির খাদ। বর্ষায় এই খাদই হয়ে ওঠে কোশিয়াড়া নদী। মাইলখানেক হাঁটার পর সামনে পড়ল একটি রেল-সাঁকো। এই সাঁকোর মুখে কোশিয়াড়ার বালির খাদে এসে মিশেছে জাওয়া নদীর মরা খাত। পশ্চিমের পাহাড় থেকে আসছে। দুই নদী আষাঢ় মাসে এক হয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল বয়ে নিয়ে যায় কোয়েলে। বর্ষার কোয়েল ততটাই সাঙ্ঘাতিক, গ্রীষ্মে যতটা নরম ও শান্ত। সাঁকো পার হয়ে আমরা মেটো পথ ধরে বাঁ ধারের জঙ্গলে ঢুকলাম। বন দফতর এদিকে আর একটা বেতলা গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। দু'ধারে শুধু কুসুম গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে টকটকে লাল ফুল। কুসুমের জঙ্গল পেরোতেই জমি গড়িয়ে নেমে গিয়েছে ঢালুতে। ঢালুর এক পাশে টিলা। টিলার পাথুরে গা ফাটিয়ে গজিয়ে উঠেছে আমলা, ধাউ, চিলবিল আর মহুয়া গাছ। টিলাটাকে বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে একটা সরু নালা! অল্প অল্প জল থানা দিয়ে পড়ে রয়েছে। নালার ধারেই কাঠের ওয়াচ টাওয়ার। বিশ ফুট উঁচু। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। রাম আর মাহাতো আগে আগে, পেছনে আমরা। বুনো ঘাস আর নরম ধাউয়ের গন্ধ বাতাসে। আমাদের দুই গাইড কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে—নির্জনতায় অভ্যস্ত জীবজন্তুর কানের পর্দা নাকি ভীষণ স্পর্শকাতর। কিন্তু নির্মল আর থাকতে পারল না—একটা ভোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিস?

ফিস ফিস করে বললাম—পাচ্ছি। কিসের বল তো? জবাবটা এল গাইড দুজনের মুখ থেকে। ওয়াচ টাওয়ারের সিঁড়ির মুখে ওরা দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির নীচে কি যেন একটা জিনিস দেখছে। কাছে এগিয়ে গেলাম। একটা বুনো শুয়োর মরে পড়ে রয়েছে। কম করেও দেড় মণ। পাগুলো টান টান। চোখ গলে গিয়েছে। মুখটা ঈষৎ ফাঁক। কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। কে মারল এই জন্তুটাকে?

উত্তর পেলাম রাত আটটায়। এর মধ্যে দুই গার্ড রাম আর মাহাতো

জঙ্গলের আদিবাসীদের ডেকে, টাঙ্গি দিয়ে শালগুঁটি কেটে, বস্তুটার পা গামছা দিয়ে বেঁধে নিয়ে ফিরে এসেছে ডাক বাংলোয়। রাম দাসের একচালার পাশের একটা বন্ধ মাটির ঘরে সব দেহটা শুইয়ে দিয়ে ছুটে গিয়েছে বেতলায়। খবর পেয়ে টাইগার প্রজেক্টের ডিরেক্টর জে পি সিং চলে এলেন। এক দিন বিকেলে উনি এসেছিলেন বেতলায় ইন্সপেকশনে। সঙ্গে একজন ভেটারনারি ডাক্তার। দুই বিশেষজ্ঞ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। রাম একটা হ্যারিকেন উঁচিয়ে ধরল। মাহাতো একটা বাঁশ দিয়ে মৃতদেহটা উল্টে পাল্টে দেখাতে লাগলো। মিনিট দশেক। দেখেশুনে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন বেচারার মৃত্যুর কারণ ছোটখাটো কোন হাত বোমা। টাইগার প্রজেক্টের বিস্তীর্ণ জঙ্গলের ভেতরে ভেতরে গোটা পঁয়ত্রিশ গ্রাম আছে। হাজার ষোল বাসিন্দা। বারো আনাই ওঁরাও, চেরো ও কিষাণ আদিবাসী। ক্ষেতের ফসল বাঁচানোর জন্য অনেক সময় আদিবাসী গ্রামবাসীরা মাঠের ভেতর হাতে বানানো বিস্ফোরক ছড়িয়ে রাখে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুনো আলু। লোভী শূকরশাবকটি না বুঝে গিলে ফেলে আর ওগরাতে পারে নি। মুখেই বারস্ট করেছে। ওই অবস্থায় পাগলের মত ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকছে। ভেবেছে নালার জলে মুখটা ঘষতে পারলে জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচবে। প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। নালা থেকে হাত দশেক দূরে ওয়াচ টাওয়ারের সিঁড়ির তলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। কর্তারা নির্দেশ দিয়ে চলে গেছেন।

ওই রাতেই রাম দাস গিয়ে পাশের গ্রাম থেকে চামার ডেকে নিয়ে এল। হ্যারিকেনের আলোয় দেখছি এক জোড়া ক্ষিপ্র হাত মৃতদেহের গা থেকে মুঠো মুঠো লোম ছিঁড়ে নিচ্ছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেহটা কেমন ন্যাড়া হয়ে গেল। তারপর একটানে গলা থেকে পেট ও তলপেট চিরে দিতেই ডাকবাংলোর মাঠটা ভ্যাপসা বোঁটকা গন্ধে পাগল করে দিয়ে নাড়িভুঁড়ি কলজে টলজে সব বেরিয়ে পড়ল। সব সাফ করে ভেতরে সের দশেক চুন ভরে দিল। তারপর অন্ধকারে দুই বন-সিপাহী রাম আর মাহাতো, চৌকিদার রাম দাস ও চামারের কাঁধের খাটিয়ায় ঝুলতে ঝুলতে পাকাপাকিভাবে বনের বাসিন্দা চলে গেল স্থায়ী আস্তানায়—বেরো গ্রামের প্রান্তে ওর জন্য তিন ফুট বাই দু ফুট মাটি খোঁড়া হয়েছে। আর কখনো কোন ক্ষেতে মুখ দিতে যাবে না।

মন খারাপ লাগছিল। বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। নির্মল বলল, চ বেতলা ঘুরে আসি। বিয়াস অপেক্ষা করে থাকবে। বললাম, তুই যা, আমি

একটু গড়িয়ে নি। কিন্তু রামদাস আর সে সুযোগ দিল না। দু বোতল মহুয়া টেবিলে রেখে বলল, চট করে মেরে দিন স্যার, বেরা দিন যা ধকল গেছে আপনাদের।

ফলিন্দর প্রসাদের মুখে টর্চ ফেলে নির্মল বলল, খাঁটি মহুয়ার প্রভাব দেখ। খড়ের মাঠে বোঝাই তোবড়ানো গাল দুটো বেশ ফুলে উঠেছে। কপালে ঘাম। রাতে গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হবে কি না—এই প্রশ্নের জবাবে প্রসাদ সারা শরীর ঝাঁকিয়ে বলল, কিসের অসুবিধে। বরং রাত্রিবেলা কম লরি চলে রাস্তায়, এখনই তো চালিয়ে সুখ।

বেতলায় ঢোকার মুখেই রাস্তা বন্ধ করে চেকনাকা। দু ধারে দুটো শাল-খুঁটির হাড়িকাঠ। তার ওপর লম্বালম্বি আর একটা শাল খুঁটি শোয়ানো। দিন রাতে জঙ্গলে গাড়ি চলাচল রেসট্রিক্ট করার জন্য। চেকনাকার চৌকিদারের খাতায় গাডির নম্বর, টাইম, ডেসটিনেশন ও সই দেওয়ার পর বন্ধ দুয়ার খুলবে। আমাদের গাড়িতে খোদ বনকর্তা বিয়াস সিং। দরজা খুলে গেল। মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁ ধারের পাহাড়ী পথ ধরে গাড়ি সতর্ক হয়ে এগোতে লাগল। টাল হারালেই অনিবার্য পতন। আর পতন মানেই বিশ পঁচিশ ফুট নীচের খাদে পাকা ভূমি শয্যা। স্পট লাইট ফেলে বিয়াস জঙ্গল দেখাচ্ছে। দু ধারে বন দফতরের হাতে পোঁতা দশ বিশ বছরের শাল জঙ্গল; গাছের মাথা থেকে মাথায় আলো ঘুরছে। দু-একটা নাম-না-জানা পাখি হঠাৎ আলোর ঝলকানি সহ্য করতে না পেরে বাসা ছেড়ে আকাশে ঝাঁপ দিল। সদ্য গজানো শাল পাতার গন্ধে বেশ একটা আমেজ। ঝটকা মেরে গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গাছের মাথা ছেড়ে বিয়াসের স্পট নেমে এল মাটিতে। গাড়ির হেড লাইট আর স্পটের আলোয় দেখলাম পাইথন কুঁকড়ে কুঁকড়ে আড়াআড়ি রাস্তাটি পেরোচ্ছে। বড় বড় খয়েরী সাদা চাকা চাকা দাগ। অন্তত দশ ফুট লম্বা। আমাদের গাড়ি থেকে তিন চার হাত দূরে। আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। পাহাড়ী পথের ওপর ছোট ছোট পাথর, অল্প অল্প ঘাস। রাস্তাটা এবড়ো খেবড়ো। সাপটার মাথার দিকটা এক এক টনে খানিক এগোচ্ছে, পর-মুহূর্তে দেহটা গুটিয়ে আসছে। বিশমিনিট লেগে গেল ওই সরু রাস্তাটা পার হতে। আস্তে আস্তে বাঁ ধারের শাল জঙ্গলে দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কানে এল বিয়াস বলছে—আমরা এসে গেছি। ওই যে অন্ধকারে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ওইটাই দুর্গ। চেরো রাজা মেদিনী রায়ের ফোর্ট। লাস্ট সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে রাজা সর্বস্বান্ত হয়ে যান।

ব্রিটিশরা কামান দেগে দুর্গের ঘরবাড়ি মানুষজন সব উড়িয়ে দেয়। পারে নি শুধু ওই সদর দরজাটা ওড়াতে। সলিড পাথরের। চওড়ায় চার হাত। শুনেছি এই দুর্গের পরিধি ছিল প্রায় দুই কিলোমিটার। এখন এই দরজাটা ছাড়া আর কিছু নেই। ভেতরে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলে সব জন্তুই আছে। বাঘও মাঝে মাঝে আসে। সবচেয়ে বেশি আছে ময়াল। নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়। চল ওই দরজার মুখ পর্যন্ত ঘুরে আসি।

স্পটটা নিতে হলে ব্যাটারীটাও সঙ্গে নিতে হয়। তা ওই বিশ কিলো মোট বইবে কে। তাই নির্মলের টর্চটা নিয়ে আমরা নামলাম। রাস্তা এখানে শেষ। সামনে বড় বড় পাথরের চাঁই, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। এগুলো পাথর নাকি পুরোনো কোনো সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ। ফাটলে ফাটলে হাঁটু সমান উঁচু লম্বা ঘাস। পায়ে আমার স্যাণ্ডেল। ঘাসের ডগায় পা লাগাতেই পা শির শির করে উঠছে। এখনো চোখে ভাসছে ওই ময়ালের দেহটা। পাথরে পা রেখে রেখে টুল সামলাতে সামলাতে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে উঠে এলাম। সামনে বিশাল ফটক। সর্বাঙ্গ পাথরে মোড়া। দিল্লীর রেড ফোর্টের সদর দরজার আদল আসে। নির্মল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো অসভ্য ফেলছে। আদিবাসী বলেই কি অসভ্য হয়? তাহলে সেই অসভ্যরা কেমন ছিল যে দু-তিনশ বছর আগে এই জঙ্গলে সত্তর আশী ফুট উঁচু পাথরের দরজা বানায়। এই বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই কোন্ পাহাড় থেকে কি ভাবে টেনে এনেছিল এই জঙ্গলে? কোন্ সিমেণ্ট দিয়ে জোড় মিলিয়েছিল, যা আজো অটুট? কামানের গোলাতেও কাবু হয় নি। জামবাটি সাইজের বড় বড় গর্ত ওই ফটকের দেওয়ালে। একেবারে মাথায় দু'ধারে দুটি টোপর পরা ঘর—নহবৎখানা? না পাহারাদারদের পাহারদারীর আস্তানা? দেয়ালের খাঁজে খাঁজে চিত্র-বিচিত্র আঁকা। কারা এই পাথরের গায়ে ছবি কেটেছিল? কোন্ অস্ত্র দিয়ে? সেই শিল্পীরাই বা কারা? তবে কি অত্যন্ত উন্নত একদল মানুষের নেতা ছিলেন মেদিনী রায় ও তাঁর পূর্ব-পুরুষরা। যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে পরাজিত প্রতিপক্ষকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ব্রিটিশরা এদের অসভ্য আদিবাসী বলে গাল দিয়েছে? আর সেটাই আমরা মেনে নিয়েছি? আর সেই সর্বস্বান্ত গৌরবকে আত্মজনের ঘৃণার হা থেকে বাঁচাতেই কি পালামৌ পাহাড় থেকে অরণ্য নেমে এসেছে এই ভগ্নাবশেষে? কে জানে সেই অবলুপ্ত গৌরবেরই উত্তরসূরী এখন কেউ ডাকবাংলোয় চৌকিদারী করছে কি না? মাঝরাতে যখন বাংলোয় ফিরে এলাম দেখি রাম দাস বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হাফপ্যাণ্ট গেঞ্জিতে ঢাকা ওই খর্বকায় মানুষটাকে দেখে বিশ্বাসই চায় না যে এরই কোন পূর্ব পুরুষের নাম ছিল মেদিনী রায়।

[৩]

আজ দু দিন হল নেতারহাটের টুরিস্ট লজে এসে চুপ চাপ বসে আছি। ভোর না হতেই স্টিলের গোল চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে লজের সামনে শান বাঁধানো কাস্তে মার্কা বেদীর ওপর ফিট করে বসে থাকি। বেদী ঘিরে রেলিং। চার ধারে হলুদ কানাইল ফুল ফুটে আছে। এক কোণে অযত্নে বর্ধিত একটা রক্তকরবী। মৌমাছির মৌতাতে বিলায়েতের মিষ্টি হাতের আলাপ ভোরের ধূসর আকাশটাকে জমিয়ে রাখে। বহু দূরে, বহু নীচে পাথরে, বালিতে শুয়ে আছে কোয়েল। পাহাড়ী নদী এ সময় বড় নিঃস্ব—শুকনো, রুক্ষ, উদাস উদাস। অপর পাড়ে থাকে থাকে পাহাড় উঠে গিয়েছে আকাশের গায়ে। সারাদিন ধরে বাতাস ওই পাহাড়গুলোকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে—ভোর রাতে আকাশ ধুলোয় মাখামাখি। চাঁদ মাথার ওপর ফ্যাকাশে। একটু বাদেই চাঁদকে ধুয়ে মুছে সাফ করে আকাশের কোথাও কোন প্রান্তে সরিয়ে রেখে রোদ্দুর ওঠে। একেবারে আবীরে মাখামাখি। চোখ জুড়িয়ে যায়। এই সময় স্থানীয় টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার বোস সাহেব ফুলের সাজি নিয়ে আসেন লজের হাতায় গজিয়ে ওঠা গোলাপ, জবা, তুলতে। পরনে ডোরাকাটা ঘুমের পোশাক। লজের পেছনে উঁচু জমিতে ওর কোয়ার্টার। বিহার সরকারের অফিসার। পাহাড়, জঙ্গল, পুরোনো স্মৃতি চিহ্ন ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালবাসেন। ভাল লাগলে ফোটো তোলেন। ওরই তোলা ফোটোয় এই দোতলা লজের একতলার লম্বা বারান্দাটা সাজানো। দোতলাটা তৈরি হয়ে পড়ে আছে—এখনো টুরিস্টদের জন্য খোলা যায় নি।

বোস সাহেবই বলছিলেন, বছরে গড়ে হাজার দশেক টুরিস্ট আসে নেতারহাটে।

—এত কম কেন? নেতারহাট তো শুনি বিহারের দার্জিলিং।

—আসবে যে প্রচার কোথায়? নেহাত বাঙালীরা আসে তাই এখানকার লোক দুটো পয়সার মুখ দেখে।

—টুরিস্টদের কত পারসেণ্ট বাঙালী?

—তা ধরুন সেভেনটি ফাইভ পারসেণ্ট।

—কেন রাঁচী, পাটনা থেকে আসে না?

—আসে। তাদেরও একটা বড় অংশ বাঙালী।

এলে পর উঠবে কোথায়? থাকার মধ্যে সরকারী বাড়ি বলতে তো এই একটা টুরিস্ট লজ। বড় জোর চল্লিশ জনের থাকার জায়গা আছে। আর আছে একটি ফরেস্ট ডাক বাংলো। বড় পোশাকী, সাহেবি কেতার। সারা বছরই বড় বড় অফিসারদের জন্য বুক করা। আর থাকার মধ্যে দু একটা বেসরকারী আবাস নিবাস। দুম করে এলে জায়গা জোটানো যে রীতিমত মুশকিল তা দু দিনেই মালুম হয়েছে।

বোস সাহেব বললেন, তাকে যারা আগে ভাগে চিঠি লেখেন, উনি তাদের পত্রপাঠ জানিয়ে দেন কদিনের জন্য কখানা রুম পাওয়া যাবে। খালি থাকলে একদিনের ঘর ভাড়া অ্যাডভান্স পাঠাতে লিখে দেন।

লজের রাঁধুনী চা দিয়ে গেল। নির্মল এখনো বিছানা ছাড়ে নি। বেলাবেলি ওঠে। প্রসাদ গাড়ির ভেতরে বসে চা খাচ্ছে। সাত সকালে উঠে গাড়িটা ধোয়াপাখলা করেছে। গাড়িটাই ওর ঘর-বাড়ি। হাজার বলেও ওকে শোয়াতে পারিনি। ঘরে কিছুতেই শোবে না। পাছে গাড়ির কলকব্জা খোয়া যায়। খোলা আকাশের নীচে এই লজের উঠোনে ওই মুর্গী-গাড়িটার দরজার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে পেছনের সিটে কুণ্ডুলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। কি ভাবে যে এতে ঘুম হয় বুঝি না।

গরম চায়ে আস্তে, জোরে চুমুক পড়ছে। টের পাচ্ছি আমার পেছনেই সূর্যোদয়ের ভিড়। পরশু দুপুরে যখন এসেছিলাম, তখন গোটা লজটাই প্রায় ফাঁকা। সন্ধ্যার পর আমাদেরই পাশের ঘরটা ভর্তি হয়ে গেল। স্বামী, স্ত্রী ও বছর তেরো-চোদ্দর একটি ছেলে। স্ত্রীর তুলনায় স্বামী ঈষৎ বেঁটে। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত একগাল দাঁড়ি। চোখে চশমা। মুখটা গম্ভীর। বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে। পায়ে জঙ্গল বুট। ট্রাউজারসের ওপর হাওয়াই শার্ট। ছেলেটিকে হিন্দিতে মনে হল কি যেন বললেন। বোধহয় রাঁচির অবাঙালী পারবার। লজের ম্যানেজার ওদের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

দু দিন ধরে দেখছি। নেতারহাটের টুরিস্ট লজের ম্যানেজার জামা-কাপড় বিশেষ একটা পছন্দ করেন না। সকাল হোক সন্ধ্যে হোক, দুধের শিশু হোক আর রূপসী যুবতী টুরিস্টই হোক ব্যবহারের কোন তারতম্য নেই। সকলের সামনে হয় একটি তোয়ালে বা বড় জোর একটি আনডারওয়্যার পরে ঘুরে

বেড়ান। মাঝে মধ্যে শখ হলে ওর ওপরই একটা স্যানডো গেঞ্জি। পঁয়তাল্লিশ বাই পঁয়তাল্লিশ সাইজের আয়তক্ষেত্র বপুটা ধীরে সুস্থে নড়ে চড়ে। হাক ডাকে লজের স্টাফের কি হয় জানি না, টুরিস্টদের পিলে চমকে যাওয়ার যোগাড়। একচ্ছত্র সম্রাটের মত চাল-চলন। টুরিস্টরা এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সম্রাট নিজের ঘরে বসে বিবিধ ভারতী শোনেন। ওই সব মুহূর্তে কারো সাহস নেই যে ডিস্টারব করবে।

অবাঙালী ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঠিক পেছনেই এসে বসেছেন। একহারা দাঘল। শ্যামলার ওপর টুলটুলে মুখখানা। শুনতে পেলাম পরিষ্কার বাংলায় ছেলেকে বলছেন—যাও, বাপীকে গিয়ে বলো সূর্যোদয়ের সময় হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় এখনো শুয়েই আছেন। ছেলেটি লাফ দিয়ে চলে গেল বাপকে খবরটা দিতে। হাত ঘড়িতে দেখি সোয়া পাঁচটা। কাল পৌনে ছটায় সূর্য উঠেছিল। বললাম, এখনো আধ ঘণ্টা বাকি।

তখনই দেখলাম যাকে অবাঙালী বলে ভুল করেছিলাম সেই মহিলার পাশেই বসে আর একটি মেয়ে। কাঁচ কলাপাতা রংয়ের ব্যাঙ্গালোরি সিল্কের শাড়িটা সুগৌর তনুদেহটি ঘিরে রয়েছে। তুলি দিয়ে আঁকা ভুরুর নীচে পাইন পাতার মত নাক ভোরের বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। হাসিটি মিষ্টি—মাড়ি দেখা যায় না, ঝকঝকে দাঁতের সারি দুধে ধোওয়া। ছোট একটা কালো তিল ঠিক ঠোঁটের ওপরেই। শাড়ির মতই হাল্কা, পল্কা, ছিমছাম। পেছনে এই সূর্য-না-ওঠা ভোরেই ফুলপ্যান্ট, শার্ট, কোমরে বেল্ট, পায়ে বুট, যুবকটি বোম্বাই মিলের স্যুটিং-এর মডেল হয়ে দাঁড়িয়ে—নির্ঘাৎ সদ্য বিবাহিত। নতুন বিয়ের ছাপ সরবাটার মত ছেলেমেয়েদের মুখে চোখে লেগে থাকে। সুগন্ধ কাছে এলেই পাওয়া যায়।

—কাল এলেন ?

ব্যাঙ্গালোরি শাড়ি লজ্জায় যেন গুটিয়ে গেল। বোধহয় অপর মহিলার সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গ কথা হচ্ছিল। আমার প্রশ্নটা বেমক্কা ঝড়ের মত সব এলোমেলো করে দিল। বোম্বাই মডেল হেসে জবাব দিল—হ্যাঁ, কাল একটু বেশী রাতে এসেছি।

—কোন ঘরে উঠেছেন ?

আঙুল দিয়ে আমাদের ওপাশের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওইটায়।

—আছেন কদিন এখন ?

—না কালই চলে যাবো।

—সে কি, এতদূরে এসে মাত্র দুটি দিন ?

—কি করব বলুন, ফ্যাক্টরি এর বেশী ছুটি দেবে না।

—কোন ফ্যাক্টরিতে আছেন ?

—রাঁচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং।

—ও আপনারা তাহলে লোক্যাল।

মণ্ডলের বয়স বেশী নয়। বড় জোর সাতাশ-আঠাশ। এরই মধ্যে কোমরে ও গালে চর্বির থাক জমেছে। বলল, আমার বাড়ি কলকাতায় যাদবপুরে। মাসে দু মাসে একবার করে যাই। তবে আমার স্ত্রী কৃষ্ণা এখানকারই মেয়ে। গৌরতনু কৃষ্ণার বড় বড় চোখ দুটি নেতারহাটের বড় ঘাঘরির মত গভীর। পাইন বনের ছায়া চোখের পাতায়।

দুটি আদিবাসী কিশোর শুকনো পাইন ফল বিক্রি করতে এসেছে এই ভোরে। বন-বাদাড় ঘুরে কুড়িয়ে এনেছে। কৃষ্ণা দেখলাম দুটি ফল কিনল কুড়ি পয়সা দিয়ে। পয়সা দিতে দিতে বলল, কাল রাতে তো আপনারা কিছুই খেলেন না। ঝরঝরে পরিষ্কার সুরেলা গলা। স্বচ্ছন্দ। আমি খেয়াল না করলেও ওরা ঠিকই খেয়াল করেছে। কাল দুপুরে গিয়েছিলাম রাজাডেরায়। সাডনি ফলসে চান করতে। নেতারহাট থেকে প্রায় বিশ মাইল। ফিরতে রাত হয়ে গেল। ফেরার পথে আদিবাসী গাঁয়ের হাটে গাড়ি থামিয়ে দু বন্ধু কেনাবেচা দেখছিলাম। মুরগি, গরু, ছাগল থেকে শুরু করে চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি, আলুর বীজ সব বিক্রি হচ্ছে। একটা বুড়ো আম-গাছের নীচে গোল হয়ে বসে কয়েকজন দেহাতী শাল পাতার ডোঙায় করে মহুয়া খাচ্ছিল। সুন্দর পানীয়। নির্মল, প্রসাদ ও আমি কাঠি গুঁজে বানানো ডোঙা। কচি পাতার ওই পত্র-পাত্রে খাঁটি মহুয়া এক অসম্ভব সুন্দর পানীয়। নির্মল, প্রসাদ ও আমি তিনজনেই ভিড়ে গেলাম ওই দলে। সঙ্গে ভাজা ছোলার চাট। ওরা সবাই খ্রীশ্চান। ওঁরাও গ্রামে সাহেববাবারা স্কুল করেছে, হাসপাতাল করেছে, উপাসনার জন্য চারচও বানিয়ে দিয়েছে। যীশুবাবার নামে উৎসর্গ করে সরু খোলার মত কাঠের লম্বা কৌটো থেকে ঢালছে আর খাচ্ছে। কতগুলি কৌটো যে খালি হয়ে গেল, শেষে আর গোনাগুনির স্টেজে ছিলাম না। অন্ধকারে গাছের চার ধারে একে একে কুপী জ্বলে উঠল, বহু উঁচুতে আকাশের গায়েও অসংখ্য কুপীর আলো। আকাশ ও মাটির ওই দুই সার আলোর স্রোতে ভাসতে ভাসতে শরীরটা অসম্ভব হাল্কা মনে হল।

বললাম, প্রসাদ তুমি গাড়ি নিয়ে পেছনে পেছনে এসো, আমরা এখন ছুটব।

—কুড়ি মাইল ছুটে এসেছেন? কৃষ্ণা ও অপর মহিলা দুজনেই যেন অবাক বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন। আর ওদের প্রশ্ন শুনেই আমারও খেয়াল হল, তাই তো কাল কতক্ষণ ছুটেছি, কতটা ছুটেছি তাতো মনে নেই। গোটা পথটাই কি ছুটে এসেছি? অসম্ভব। তাহলে তো ম্যারাথন রেসে নামার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছি।

—তা কম করেও মাইল চারেক তো হবে। নির্মল উঠে এসেছে। পাজামার ওপর একটা লাল কম্বল জড়িয়েছে গায়ে। হাতে চায়ের কাপ। সিনেমার হিরোর মত লম্বা ঢেউ খেলানো এক গুচ্ছ চুল ওর চওড়া কপালে নেমে এসেছে। ঘুম ভাঙা ভারী গলার স্বর। অম্লান হাসি মুখে। দুই মহিলাই একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কাল রাতে খাব কী, এত মহুয়া খেয়েছি যে আর অন্য কিছু খাওয়ার মত অবস্থাই ছিল না। তাও তো দৌড়ে হাল্কা খানিকটা হয়েছিলাম বলে লজে ফিরে মনে হল কিছু একটা খেলে ভালো হতো।

—তাই বুঝি ডাইনিং হলে এসেছিলেন? শ্যামলা হলেও মহিলার চোখ দুটি বড় বড় ভাসা ভাসা। যেন কথা বলে। অপরিচিতা বা সদ্য পরিচিতার চোখে চোখ বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয়। অসভ্যতা, নাকি হ্যাংলামি। আসলে এসব ভাবনা নিজেরই। অথচ তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। যাকে দেখছি তার কি এই ধরনের অ্যাপ্রিসিয়েশন ভালো লাগে না? হয়তো লাগে, হয়তো লাগে না। ভদ্রমহিলা চোখ জোড়া নামিয়ে ছিলেন। ছেলে বাবার হাত ধরে টানতে টানতে এসে দাঁড়াল মায়ের পেছনে। এত ঝকঝকে তরুণী চোখ যার তার ছেলে নাইন বা টেনে পড়ে ভাবতেও মন কেমন বিষণ্ন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে বললেন: তুমি মিস করলে।

ভদ্রলোকের গলার স্বর ওর গালের দাঁড়ির মতই নিবিড়। বললেন, বাথরুমে এক ফোঁটা জল নেই। কাল রাতে সেই যে লোডশেডিং শুরু হয়েছে, এখনো আলো আসে নি। আরো বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওর গলা ডুবিয়ে দিয়ে রেডিও বেজে উঠল: কভি কভি মেরা দিল মে। ম্যানেজারটা অসহ্য। এই ভোরে, পাহাড় যখন কচি রোদ্দুরে চান করছে তখন ট্রানজিস্টর চালিয়ে দিল। ওর ধারণা টুরিস্টরা বোধহয় এসব খুব পছন্দ করে। তাই খুব চড়া করে বাজাচ্ছে। বলেও লাভ হবে না। নিজে না বুঝলে, কেউ কি বলে বোঝাতে পারে।

শিবনাথ শাস্ত্রীরা আজই সকালে ফিরে যাচ্ছেন। আটটা নাগাদ নেতারহাট বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাস ছাড়বে। রাঁচির। ছিয়ানব্বই মাইল। পৌঁছোতে পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। রাত নটায় কলকাতার ট্রেন। ওদের এখুনি ঘর ছাড়তে হবে। একটা বিরাট বাস বোঝাই করে দুর্গাপুর থেকে কয়েক ডজন টুরিস্ট এসে এই মাত্র নেমেছেন। ম্যানেজারের সঙ্গে তাদের হাই লেভেল মিটিং চলছে। ম্যানেজারের বক্তব্য খুব ক্লিন, এত লোকের জায়গা কোথায়? দুর্গাপুরীরাও ছাড়বেন না—তারা চিঠি দিয়েই এসেছেন। চিঠি লেখাটাকে ম্যানেজার অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন: পাল্টা চিঠি না পেয়ে কেন হুট করে চলে এলেন?

তর্ক-বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। নেতারহাটের এই টুরিস্ট লজ এতক্ষণে সত্যি সত্যি একটা ইট হয়ে উঠেছে। আর টেঁকা যাচ্ছে না। কৃষ্ণা আর ওর স্বামী অশোক হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল। বড় ঘাঘরি, ছোট ঘাঘরি ওদের এখনো দেখা হয় নি। দেখা হয় নি লেকটাও।

প্রসাদ গাড়িটাকে নিয়ে ব্যস্ত। তেল-টেল সবই আছে। যত গণ্ডগোল ওই ব্যাটারীটাকে নিয়ে। অথচ অবাক কাণ্ড গত সাত দিন ওই ব্যাটারীটাই গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। চালানো মানে চাট্টিখানি কথা নয়। পিচ বাঁধানো রাস্তা তো দূরের কথা, রাস্তাই যেখানে নেই, শুধু পাথুরে মাটি, পাথর আর নুড়ি, শুকনো সব বালির খাত, মরা, নদীর সোঁতা সব কিছুর ওপর দিয়েই ঠিক ঠিক চলেছে। অবিশ্যি এর মূলে নির্মল।

মেদিনী রায়ের ফোর্ট দেখার পর দিন দুপুরে ঠিক করলাম যাব সোজা মহুয়াটাঁড়। পালামৌ জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত। বিহার যেখানে ভোজালির মত মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়েছে সেই টিপটা। এগারোটা নাগাদ প্রসাদ গম্ভীর মুখে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ঘরে এল। টেবিলের ওপর সাজানো বিস্কুটের প্যাকেট, সরষের তেলের বোতল, ওষুধের প্যাকেট, চাল, ডাল ও ডিমের তিনটে আলাদা থলি। সব আসার সময় ডাল্টনগঞ্জ থেকে কিনে আনা। বসে বসে লিখছিলাম। নির্মল একটা অ্যাডভেঞ্চার স্টোর পড়ছিল। পেপিরাস। টেবিল থেকে সরষের তেলের বোতলটা খুলে ডান হাতের তালুতে খানিকটা ঢেলে নিল। মাথায় বুলোতে বুলোতে প্রসাদ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

—আমরা ঠিক একটায় বেরোব প্রসাদ। বই থেকে চোখ না তুলে বলল নির্মল।

টাকে তেল ডলতে ডলতে নির্বিকার মুখে প্রসাদ বলল, আজ হবে না।

—কি'উ ? বইটা বিছানায় রেখে ধড়মড় করে উঠে বসল নির্মল। আমার কলমটাও গেল থেকে।

—ব্যাটারী ডাউন।

—তোমাকে যে বললাম সকালে গাড়িটা বার করে মাইলখানেক রেসিং করিয়ে আনো।

—কি করে করব ? গাড়ি যে স্টার্টই নিল না।

—হ্যানডেল মারলে না কেন ?

—মেরেছি, তাতেও হল না।

—রামদাস আর ফরেস্ট গারডদের দিয়ে খানিকটা ঠেলে নিলেই তো স্টারট নিত।

—ওরা যদি ঠেলতে রাজি না হত ?

এতক্ষণ কথাবার্তা হিন্দীতেই চলছিল। নির্মল এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্বগতোক্তির মত বলল, দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি। তুমি যেমন বুনো ওল, আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল। প্রসাদ এখুনি ব্যাটারীটা খুলে নিয়ে সোজা বেতলা চলে যাও। ওখান থেকে লরি বা ট্রাক পাবে। তাতে চেপে চলে যাও রাঁচি। সারিয়ে কাল দুপুরে ফিরবে! আর হাজরাবাবুকে বলবে এই দুদিন গাড়ি চলেনি, ঠায় বসেছিল—এক পয়সাও ভাড়া দেবো না।

বাইরে চড়চড়ে রোদ। গাছপালা পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। এক গ্লাস জল খেতে না খেতেই আর এক গ্লাস খেতে ইচ্ছে করছে। ঘাম হয় না, অথচ গায়ে রোদ পড়লে চামড়া ফামড়া সব পুড়ে যায়। অভ্যস্ত আদিবাসীরাও এ সময় বেরোয় না। যে যার মাটির ঘরে পড়ে আছে। বন্য জন্তুরাও সকাল সকাল জলভরা নালা বা ছায়া। ছায়া জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই দুপুরে আধমণী এই ব্যাটারিটা ঘাড়ে নিয়ে আট কিলোমিটার হেঁটে বেতলা যাওয়া, তারপর কোন শাল-খুঁটি বা বাঁশের ট্রাকে হাতে-পায়ে ধরে রোদে ভাজা ভাজা হয়ে শেষে রাঁচি পৌঁছলেও আর ফিরতে পাবে কিনা সন্দেহ। যে ছবিটা আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি, অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রসাদের কাছে নিশ্চয় তা জলের মত ক্লিয়ার। মুখের নির্বিকার ভাবটা মুহূর্তে কেটে গিয়ে কপালে গালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠল প্রসাদের। গলার স্বরও বদলে গেল : আমি স্নান সেরেই গাড়িটা নিয়ে পড়ছি। ঠিক একটার আগেই যে করে হোক রেডি করে ফেলব।

নির্মলের মুখ চোখ এখন নির্বিকার। গলাটা মোটা করে বলল: দেখা যায় না।

পনেরো মিনিটের ভেতরেই বাইরে মরা গাড়িটার জ্যান্ত হওয়ার হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল। রামদাসের ছেলে আর একটা গুঙ্গা কিশোর গাড়িটা ঠেলছে। রামদাস বলে ওর ওই একটিই ছেলে। গুঙ্গাটা অনাথ, তাই দয়া পরবশ হয়ে ঠাঁই দিয়েছে। নির্মলের ধারণা অবশ্য ঈষৎ ভিন্ন।

কাঁটায় কাঁটায় একটায় আমরা বেরোলাম। ফিরতে রাত হবে। যেতে আসতে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার। রামদাসকে ডিনার রেডি রাখতে বলে দিলাম। ড্রাইভারের সামনের আয়নায় চোখ পড়তেই দেখি প্রসাদের জ্যান্ত চোখটা পাথরের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই বাঁ চোখটা সরিয়ে নিল। প্রসাদের কাছে ব্যাকসিটের মানুষ দুটো সম্ভবত আর সাদামাটা টুরিস্ট নয়—স্রেফ খুনে। উদ্ভট চরিত্র। রাতে রাত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে রোদ যত চড়ে তত এদের ঘোরের নেশা বাড়ে। খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। রাতের অর্ধেক ডিনার দিয়ে সকালে ব্রেকফাস্ট সারে। সারাদিন কাটে তাজা টাটকা বৃক্ষরসে।

রাস্তাটা এখানে একটা নালার ওপর দিয়ে ছুটছে। লোকাল নাম বানারী নালা। সিমেণ্ট বাঁধানো কজওয়ের দুধারে মরা খাত জুড়ে বড় বড় দানার হলুদ বালি। বালির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র মরা শুকনো পাতা। খানিকটা এগোতেই রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে গেল। ডান দিকের লাল মেঠো পথ চলে গিয়েছে ছিপাদহ হাটের দিকে। রামদাস এই হাট থেকেই মুরগী কিনে নিয়ে যায়। চাল, ডাল ফুরিয়ে গেলে এই হাটই একমাত্র ভরসা। মেঠোপথ ডান হাতে রেখে পিচ বাঁধানো রাস্তা ধরে গাড়ি এগোচ্ছে। দুধারে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু শিশু শাল সবুজ পাতায় মসৃণ। সামনেই ছিপাদহ রেল গুমটি। দুবার কষে হর্ন দিতেই গুমটিঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুমটিম্যান দরজা দুটো খুলে দিল।

আদিবাসীরা দারুণ ক্ষুব্ধ। পাহাড়ে উপত্যকায় এত গাছ, এত কাঠ, সরকারী কানুনের ঠেলায় এক টুকরোও পাওয়ার জো নেই। এই গরমে কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি লেগে বা রেলের ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার আগুনে বনে দাবানল জলে ওঠে নিত্যি। লাখ লাখ টাকার জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাতে সরকারের কোন আপত্তি নেই, যত আপত্তি গরীব গুর্বোরা যদি ভাত ফুটোনোর জন্য বা রামদানার আটা দিয়ে রুটি পাকানোর জন্য কয়েক টুকরো

কাঠ কুড়িয়ে নেয়। তাহলেই থানা পুলিশ, মারধর, জেল। গ্রীষ্মের পালামৌ জঙ্গলের মতই আদিবাসীরা খেপে অঙ্গার হয়ে আছে। আর তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে পলিটিশিয়ানরা। সেই গল্পই শুনলাম বিয়াস সিংয়ের মুখে।

ঘরদোর ছেড়ে ছুড়ে একলা মানুষটা পড়ে থাকে এই জঙ্গলে। রাত-বিরেত নেই, অরণ্যজন্তুর তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে ফেরে খালি হাতে। ভ্রূক্ষেপও নেই। করেও না। কিন্তু মানুষ-জন্তুর মুখোমুখি হলেই অস্বস্তি বোধ করে। সারা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সকালবেলা কোয়ারটারে ফিরে দেখে বাড়ির সামনে শ পাঁচেক আদিবাসীর এক উত্তেজিত ভিড়। হ্যাণ্ড মাইক মুখে ঠেকিয়ে ভিড়টাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে চলেছেন এক প্রাক্তন এম-এল-এ। একদা এই জঙ্গলের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পাটনায় গিয়েছিলেন। পাঁচ বছর তার টিকিও কেউ দেখেনি। এবার হেরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। এসেই ঘোঁট পাকাচ্ছেন। প্রাক্তন এম-এল-একে ঘিরে তার নিজস্ব চামচার দল। পাকানো গোঁফ লম্বা জুলপি, বাবরী চুল, পরনে দামী ফিনফিনে ধুতির ওপর সাদা টেরিকট-এর পাঞ্জাবি। বক্তার গলায় গনগনে আগুন—ভাঁইয়ো, এই জঙ্গল কার? এই মাটি কার? সব তোমাদের। অথচ তোমাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বদমাইস সরকার। গুষ্টির তুষ্টি করি এই সরকারের। আর এই সরকারের পাজির পা ঝাড়া যে সব অফিসার তোমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দেয় না তাদেরও গুষ্টির তুষ্টি করি। তোমরা যদি চাও তো তোমাদের এই জন্মভূমিতে এক টুকরো জমি পাবে না, একটা ঘর তুলতে পারবে না, অথচ জঙ্গলের অফিসার দেখ কেমন সুন্দর এই মন্দির গড়ে তুলেছে। এই মন্দিরের জমি কার? এ জমি তোমাদের।

ও হরি, অ্যাটাকটা সে ঘুরে বিয়াসের ওপর ডিরেক্ট এসে পড়ছে। কোয়ারটারের সামনে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ছোট একটা ফুলের বাগান নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। ওই বাগানে ভেতরেই কুললক্ষ্মী নওলাক্ষার মন্দির বানিয়েছে বিয়াস। ব্যাটাচ্ছেলের টারগেট তাহলে ওই মন্দির। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জ্বালাময়ী ভাষণ। তোমাদের যারা কাঠকুটো সংগ্রহ করতে দেয় না, জঙ্গলে ঢুকতে দেয় না, তারা তোমাদের শত্রু। সব আদিবাসীর শত্রু। তোমাদের দেওতার কোন মন্দির নেই অথচ এই বিধর্মী নিজের দেওতার মন্দির বানিয়েছে তোমাদের জমিতে। তোড়ো ইয়ে মন্দির, তোড়ো।

জনতাও টগবগ করে ফুটছে। যে কোন মুহূর্তে কাঁটাতারের বেড়া ছিঁড়ে-ফুড়ে ভেতরে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। ফরেস্ট গারডরা যে যার

বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে। শেষে না একটা কেলেংকারী হয়। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে।

সোজা ভিড় ঠেলে বক্তার সামনে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করল বিয়াস : আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। যদি মাইকটা একবার দেন।

চামচারা সঙ্গে সঙ্গে বিয়াসকে ঘিরে ধরে গলা কাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল—কভি নেহি। আদিবাসীদের দুষমন এই সরকারী অফিসারের কোন কথা কেউ শুনবে না।

চালাকিটা পরিষ্কার। একতরফা লোক খেপিয়ে গণ্ডগোল পাকানোই উদ্দেশ্য। হাত মাইকের প্রয়োজন নেই। শ' পাঁচেক লোককে অ্যাড্রেস করার মত গলার জোর আছে। রাস্তার ওপর বন দফতরের জিপটা দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে জিপের বনেটের ওপর উঠে বিয়াস করজোড়ে জনতাকে সম্বোধন করে বলল. আপনারা আমাকে চেনেন। ছেষট্টি সাল থেকে এই জঙ্গলে পড়ে আছি। আমার বৌ-বাচ্চা কেউ এখানে থাকে না। আমি একাই থাকি। প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন মনে আছে এই জঙ্গলে সবাই কাঠ কাটতে পারত। বলুন পারত কি না ?

জনতা নীরবে শুনছে। হ্যাঁ বা না কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি মনে মনে অঙ্ক কষে নিল বিয়াস। জবাব আসুক ছাই নাই আসুক, থামলে চলবে না। বলে যেতে হবে।

তারপর বাহাত্তর সালে সরকার নতুন কানুন করল। জঙ্গলের কাঠ কাটলে জেল হবে। আমি সরকারের নোকর। সরকার যা করতে বলবে. তাই করতে বাধ্য। কিন্তু আমি জানতে চাই, যে বা যারা আজ আপনাদের জন্য চোখের জল ফেলছে, তারা কেন ওই কানুন বানানোর সময় বাধা দিল না। আপনারা জানেন, কানুন বানায় এম-এল-এরা। মাননীয় বক্তা যিনি এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তারাই এই কানুন বানিয়েছেন। গত পাঁচ বছরে ওই কানুনের জন্য আপনাদের হাত-পা বাঁধা ছিল। এখন ভোটে হেরে গিয়ে বলছেন, কানুন তোড়ো। এ কি ধরনের কথাবার্তা, আপনারাই বলুন।

জনতা যেন ঈষৎ চঞ্চল। প্রাক্তন এম-এল-এ ও তার সঙ্গীরাও। প্রাক্তন এম-এল-এ মাইকটা মুখে নিয়ে কি যেন বলতে গেলেন, তার আগেই চঞ্চল জনতা গর্জন করে উঠল : ওকে বলতে দাও।

এতক্ষণে যেন পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেল বিয়াস। উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ, ঘাড়, গলা ভাল করে

মুছল। তারপর আরো একধাপ চড়িয়ে দিল গলা: আইন করেছিস বেশ করেছিস, আমরা সরকারী কর্মচারী হুকুমের দাস, সব মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু যাদের ভোটে জিতে পাটনায় গেলি, গত পাঁচ বছরে তাদের জন্য কি করেছিস? একবারও এসে খবর নিয়েছিস যে এরা কেমন আছে? খেতে পায় কিনা? চাষের জমি আছে কিনা? মাথার ওপর একটা চালা আছে কিনা? উনুন জ্বালানোর মত কাঠ-কুটোর সংস্থান আছে কিনা? কানুন তো সরকার করেছে। কিন্তু আজ যারা উসকানি দিচ্ছে তাদের পার্টি তো বিরাট পার্টি, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টি। টাকা-কড়ির তো কোন অভাব নেই। কানুন করে যাদের ভাতে মারলি তাদের জন্য পার্টি ফাণ্ড থেকে দুটো পয়সা দান খয়রাত করতে কে বারণ করেছিল'? জবাব দাও।

ভিড়টা রীতিমত ক্ষুব্ধ। মুখে মুখে স্লোগানের মত গর্জন উঠল: জবাব দাও। আড় চোখে তাকিয়ে দেখে বিয়াস, চামচারা ব্যাটারী সমেত হ্যাণ্ড মাইকটা গুটিয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলেছে। নেতা অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছেন। জনতা স্লোগান দিচ্ছে: জবাব দাও।

আবার খেই ধরল বিয়াস: ভাইয়ো, আপনারা জানেন আমি গরীব সরকারী অফিসার। মাস গেলে সাতশ টাকা মাইনে পাই। বাড়িতে পাঠাই পাঁচশ টাকা। ঘরে স্ত্রী ও পাঁচটি বাচ্চা। নিজের জন্য রাখি দুশ টাকা। যদি চান, আপনারা সে দুশ টাকাও নিয়ে নিতে পারেন। আমার তো বদখেয়াল নেই। পাটনায় গিয়ে পড়েও থাকি না। বা নিজের কোন গাড়িও নেই। এই জিপটা সরকারের। সরকারী কাজ ছাড়া চড়িও না। যদি দয়া করে দোবেলা দুটো করে রুটি আর একটু ডাল দেন তাতেই চলে যাবে।

চামচারা সব গাড়িতে। অসহায় নেতা ফাঁক খুঁজছেন, কি করে এই ভিড়ের পাশ কাটিয়ে গাড়িতে উঠবেন, সম্ভবত তার সুযোগ পাচ্ছেন না। আউর এক ধাক্কা, তাহলেই চিত্তির হয়ে পড়বে। ভাইয়ো, আপনারা জানেন নওলাক্ষা বড় জাগ্রত দেবী। শ্রাবণ মাসে দেবীর পুজো হয়। তার পর আপনারা মন্দির রাখুন, তুলে দিন কিছু বলব না। কিন্তু পুজোর আগেই, এই বৈশাখে যদি কেউ দেবীর মন্দিরে হাত দেয় তাহলে দেবী তাঁকে ভস্ম করে দেবে। সেই জন্য কি নেতা নিজের হাতে মন্দির না তুড়ে আপনাদের দিয়ে তোড়াতে চাইছেন? তাতে যদি দোষ হয় তাহলে আপনাদেরই হবে—নেতার দোষ হবে না।

আর বক্তার দরকার নেই। নেতার কাছা ধরে ঝুলছে কয়েকজন।

বিদ্যুৎগতিতে কোমরের গিঁট খুলে ফেলে দিয়ে হরিণের মত তিন লাফে ভিড়ের ওপর দিয়ে প্রায় ভাসতে ভাসতে নেতা উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লেন গাড়িতে। গাড়ি আগে থেকেই স্টার্ট নিয়েছিল। জনতার হাতে হাতে ধুতির টুকরো, পাঞ্জাবির পকেট, আণ্ডারওয়্যারের ফিতে। মোটর রেসের লাস্ট ল্যাপের স্পিডে নেতার প্রাইভেট কারটা ছুটছে। পেছনে হঠাৎ বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা পাহাড়ী নদীর মত আদিবাসী জনতা। সে কি গর্জন, সে কি প্রচণ্ড ক্রোধ!

এই মাত্র আমাদের গাড়ি গারু নদীর ওপর সেতুটা পার হয়ে এল। পাহাড়ী নদীর পক্ষে বেশ চওড়া। শুধু বালি আর পাথরে বোঝাই। জল নেই এক ফোঁটাও। সামনে ডান দিকে বন-দফতরের ডাক-বাংলো। ডাক-বাংলোর পরই রাস্তার দুধারে বাজার বসেছে। আজ হাটবার। ওঁরাও, চেরো মেয়েরা বিরাট বিরাট ভারী ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ছুটছে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে প্রসাদের হাতের খেলায় গাড়িটা ক্যাজুয়ালি ছুটে চলল।

সামনেই একটা পাহাড় এই পিচ রাস্তার ওপর আভূমি নত হয়ে আছে। আমরা ওই মাথায় চড়ে বসলাম। বোধহয় আড়াই হাজার ফুট ওপরে এখন। দুধারে বাঁশের ঝাড়। কচি বাঁশ। বিশেষ লম্বা চওড়া নয়। ছোটখাট সাইজের। সার দিয়ে রাস্তায় লরি দাঁড়ানো। আদিবাসী পুরুষ ও রমণী বাঁশ কাটছে। কলকাতার কাগজ কলে চালান যাবে।

ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি নামছে। অসংখ্য ছোটখাটো নালা দু পাশের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। জল নেই। শক্ত পাথরের গায়ে গত বর্ষার দাগ ধূসর হয়ে আছে। নালার ধারে যেখানে এখনো একটু জল আছে সেখানে চিরো ঘাসের মসৃণ কারপেট বিছানো। রোদের ঝাঁঝ একটু মরেছে। তিনটে প্রায় বাজে। মারোমার এই মাত্র পার হয়ে এলাম। অর্থাৎ অর্ধেক পথ কাবার।

বারেষাঁড় হয়ে যখন মহুয়াদাঁড়ে পৌঁছুলাম তখন সূর্য বিহারের সীমান্তে পাহাড়সারির মায়া ছাড়িয়ে মধ্যপ্রদেশের ঘন অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। খেড় এখন আটাত্তর কিলোমিটার দূরে। একটা বিরাট টেবল-ল্যাণ্ড এই মহুয়াদাঁড়। চারধারে দূরে দূরে পাহাড়। রোদে পোড়া মাটি ধুলো ধুলো। একপাল ন্যাংটো আদিবাসী ছেলেমেয়ে আমাদের গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে। রাস্তার ধারে কয়েকটা ভাজাভুজির দোকান। শালপাতার ঠোঙা দোকানগুলো মুখে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। প্রসাদ গাড়ির জল লাগবে বলে বোতল নিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল একটা গলির ভেতরে। একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন

র্ন বাজছে। বোধহয় ছাড়ার সময় হয়ে এল। গাড়ির কপালে হিন্দিতে বড় বড় হরফে লেখা ডালটনগঞ্জ। এরপর আর বাস নেই। আমরা দু ঠোঙা ভুজিয়া কিনে গালে ফেলতে লাগলাম।

দূরে ধুলো উড়িয়ে একটা ভ্যান ছুটে আসছে। মোটামুটি চোখের রেঞ্জে আসতেই ভ্যানের গায়ের লেখা পড়ে বুঝলাম স্থানীয় চারচের গাড়ি। ভেতরে ড্রাইভারের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক মহিলা স্টিয়ারিং ধরে আছে। লারনার। গাড়ি চালানো শিখছে। পরনে গেরুয়া রংয়ের সিল্কের শাড়ি। মাথায় গেরুয়া ক্যাপ, অনেকটা নারসের টুপির মত। আমাদের গাড়িটা রাস্তার আধখানা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ভ্যানটা থেমে গেল। আস্তে আস্তে পাশ কাটাচ্ছে। মহিলার গাত্রচর্ম উজ্জ্বল শ্যাম, চোখে মুখে যথেষ্ট চটক। কিন্তু বাজারের লোকজনের সামনেও বিকারহীন মুখে ড্রাইভারের প্রায় কোলে বসে গাড়ি চালাচ্ছেন। মুখে চোখে ডোণ্ট কেয়ার ভাব। ড্রাইভারের বাঁ হাতটা ভদ্রমহিলার কোমরে। আদিবাসীদের উন্নত করার ব্রত নিয়ে এই জঙ্গলে জায়গায় এসে দেশজ শহুরে আদব-কায়দাগুলো শাড়ির আঁচলের মতই গা থেকে খসে গিয়েছে। পীনোন্নন পয়োধারা। হাটুরে মানুষজন ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে। সম্ভবত অসভ্যদের যারা সভ্য করতে আসে তারা অসভ্যদের চাউনী-টাউনীগুলোকে পরোয়া করে না। একগাদা ধুলো নাকে মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ভ্যানটা চলে গেল।

ফিরতি পথে বারেষাঁড়ে এসে প্রসাদ বলল, সাবধান সাব, হাতি। কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দুজনে নড়ে-চড়ে উঠলাম। এখানে দুধারে জঙ্গল ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। বিলবিল, আসান, ধাউগাছের সার। ওই গাছগুলোর পরেই বাঁশের ঝাড়। বিশাল বিশাল পোড়া বাদামী কোট গায়ে দিয়ে সন্ধ্যার মুখে কচি বাঁশ দিয়ে ডিনার সারছেন তাঁরা—মা, বাবা ও তিনটি বাচ্চা। গাড়ির আওয়াজে বাবামশাই মুখটা ঘুরিয়ে সোজা আমাদের দিকে তাকালেন। বেশি নয়, পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরে। ওরা যে বেশিক্ষণ আসেননি, তার প্রমাণ রাস্তার দুধারেই। বড় বড় ধাউ আর আসান গাছ গুঁড়ি ভেঙ্গে উল্টে আছে। কাছ থেকে দেখলে জমবে—দুজনেই নেমে পড়লাম রাস্তায়। প্রসাদ বিড় বিড় করছে। ওর হাতে একটা বোতল। গাড়ির ভেতরে জমাট মিষ্টি গন্ধ। গাড়ির ও ড্রাইভার দুজনেরই পানীয় মহুয়াদাঁড় থেকে প্রসাদ জোগাড় করে এনেছে।

আস্তে মাদী হাতিটাও ঘুরল। বাচ্চা তিনটে লেপটে রয়েছে মার কোলের

কাছে। সামনের একটা ঝাঁড়ের বাঁশ মটকে পড়ল। তারপর আরো কয়েকটা। মদ্দাটার চোখের চাউনী অনেকটা বাংলা স্কুলের ইংরেজির মাস্টারের মত। শুঁড় নয় তো ডাসটার। এখুনি ছাত্রদের আঙুলের গাঁটে গাঁটে কষাবে। দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে। আর বড় জোর বিশ ফুট। প্রসাদ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল : হাম গাড়ি ছোড় দেগা।

কথায় কথায় যে ব্যাটারী ডাউন হয়ে যায়, প্রাণের ভয়ে তাও এখন চাঙ্গা। হ্যানডেল লাগল না। কোৎ ধাক্কা না। চাবি ঘোরাতেই গর গর করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে একটা বাঁশঝাঁড় ছত্রাখান হয়ে পড়ল। শুধু কানে এল নির্মলের আর্তনাদ : রান, পিনাকী রান। বাদামী কোট ছুটে আসছে।

টেনে দরজাটা বন্ধ করে ওঠার আগেই দেখি গাড়ি সেকেণ্ড, থারড শেষ করে লাস্ট গিয়ারে পৌঁছে গেছে। জানালায় মুখ রেখে দেখতে পাচ্ছি বারেষাঁড় রেনজটা বিলবিল, আসান, ধাউয়ের বেড়া ভেঙ্গে দলমল করে ছুটে আসছে। আপনা আপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা আর অশোক দুপুর বেলা ফিরে এল লজে। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু নেতারহাট। না ঠাণ্ডা, না গরম, চমৎকার বাতাস। রোদের ঝাঁঝ নেই। তবু অনেকটা পথ ঘুরে আসায় কৃষ্ণার ফরসা মুখখানা টকটক করছে। আমাদের মালপত্র গাড়িতে ওঠানো সারা। হাতে গড়া রুটি, মুরগীর মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে এইমাত্র লানচ সেরে উঠেছি। প্রসাদ গাড়ির তেল, জল ইত্যাদি ঠিক ঠাক আছে কি না চেকআপ করে নিচ্ছে। নির্মল গেছে ম্যানেজারের ঘরে বিল মেটাতে। বারান্দায় পা রেখে কৃষ্ণা যে চমকে উঠল : আপনারা কি চলে যাচ্ছেন ?

বললাম—হ্যাঁ। তবে যাওয়ার পথে একবার খেড় ডাক বাংলোটা ঘুরে যাব।

—কেন নেতার হাট ভালো লাগছে না ?

—লাগছে। তবে বেশী দিন এক জায়গায় থাকলে পা দুটো কেমন অচল অচল। থিতু হতে মন চায় না।—

যেন আপন মনেই বলল কৃষ্ণা, দিদিরাও আজ সকালে চলে গেলেন। ভাবলাম আপনারা থাকবেন। তা আপনারাও চলে যাচ্ছেন।

অশোক প্রসঙ্গটা ঘোরানোর জন্য বলল, কৃষ্ণার গান আপনারা শুনলেন না। ও দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গান।

—তাই নাকি। বেশ তো। চলুন আমাদের ঘরে। এখনো রওনা হতে আধঘণ্টা বাকি। খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত তো মধু।

লজ্জায় কৃষ্ণার লাল মুখটায় যেন একরাশ আবীর মাখিয়ে দিল। নির্মল বিল্লু মিটিয়ে ফিরে আসছে। পেছনে ম্যানেজার তার বিখ্যাত নিজস্ব ইউনিফরমে।

—কি রে দাঁড়িয়ে কেন চল। আর দেরি করলে খেড় পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।

—একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত—

—এই দুপুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত! নির্মল একেবারে মত্ত হাতীর মত শুঁড় পাকিয়ে উঠল। আমার কথা শেষ হওয়ার আগে এমনভাবে মুখ বেঁকিয়ে উঠল যে, আর কিছু বলা চলে না। মেয়েটার মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। অশোকও বিব্রত। কিন্তু নির্মলের কোন রাখঢাক নেই—চ, চ, দুপুরবেলা গান ফান আর শুনতে হবে না।

হঠাৎ যেন ওর খেয়াল হল, এত হড়বড় করে বলাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে অ্যামেণ্ড করে নিল—কে গাইবে?

—কৃষ্ণা দারুণ গান গায়।

জিভ টিভ কেটে কৃষ্ণার সামনে হাতজোড় করে বলল, মাপ করবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। না, না, গান না শুনে কিছুতেই যাচ্ছি না। চলুন, চলুন আমাদের ঘরে চলুন।

হৈ হৈ করে এক মুহূর্তে জমে ওঠা গুমোট তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে নির্মল ঘরে ঢুকল। মাঝে মাঝে এমন এক একটা ওল নামায় নির্মল যে, পরে সামাল দিতে ওরই ঘাম ছুটে যায়। তবু যা হোক ম্যানেজ তো করেছে।

সেদিন খেড়ে পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে গেল। আধখানা বাটির মত একটা চাঁদ তখন পালামৌ রেঞ্জের মাথায়। বাতাস ভারী। ঠাণ্ডা। বোধহয় দূরে কোথাও দু এক পশলা হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে চোখে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কৃষ্ণার গলায় আগুনের পরশমণি এখন সমস্ত প্রাণ ছুঁয়ে আছে। স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ। বেদনার দানার মত প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা ভাঙ্গা যায়। অথচ পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। গান থামিয়ে দুম করে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা কি এভাবেই দুজনে ঘুরে বেড়ান।

: তার মানে? প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারি নি বলেই ব্যাখ্যা চাইলাম।

একটু যেন অশ্বস্তি বোধ করছে। বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে—মানে শুধু আপনারা আপনারাই ঘোরেন। আর কেউ কখনো সঙ্গে থাকে না?

অর্থাৎ বিবাহিত কি না? আমরা নির্ভেজাল দুটি এড়ে গরু না, গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নটাই করতে গিয়ে মেয়েটা ঘেমে নেয়ে উঠছে। একসঙ্গে দুজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। নির্মল জবাবটা দিল—কবিতা টবিতা আমার খাদ্য নয়, তবু একটা লাইন মনে আছে, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নাহিলে খরচ বাড়ে।

আর যদি কখনো রাঁচি আসি তাহলে নিশ্চয় যেন ওদের বাড়িতে উঠি। কৃষ্ণা, অশোক বার বার অনুরোধ করছে। গাড়ি ছাড়ছে। অশোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। কৃষ্ণার মুখটি গাড়ির জানালায়। পাইনের ছায়া ওর দুই চোখ জুড়ে: আসবেন তো?

বললাম: আসব, নিশ্চয় আসব।

গাড়িটা আস্তে আস্তে পাহাড়ী পথ ধরে ওপরে উঠছে। দুধারে পাইন ও দেবদারুর সারি। ছায়া ছায়া পথ। দূরে লেকের জলে এক টুকরো মেঘ আটকে আছে। প্রসাদের মুড আজ ফাইন। বোধহয় একটা বোতল সকালেই খালি করে দিয়েছে। কিছু আর ভাল লাগছে না। বিষণ্ণতা যেন পেয়ে বসেছে। হয় না কখনো কখনো, যখন বিষণ্ণতাও বুকের ভেতর ছবি আঁকে।

॥ ৪ ॥

মাঝে দুটো দিন বাদ দিয়ে আবার আমাদের ফিরে পেয়ে খেড ডাকবাংলোটা হৈ হৈ করে উঠল। শহরে রাত দশটায় কোন রাতই না, কিন্তু পালামৌর এই জঙ্গলে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বারো ঘণ্টার টানা লোড শেডিংয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সেখানে সন্ধ্যা হলেই আঁধার ঘনায়। ওরা জানত আজ আমরা ফিরব। আরো জানত পাগলা দুটো সময় কানা। রাতফাত কেয়ার করে না। উঠল বাই তো জঙ্গলমে যাই। তাই সবাই জেগে বসেছিল। সেই কালো অপুষ্ট গুন্দা ছেলেটা ছুটে এসে গেট খুলে দিল। পেছনে পেছনে ছুটে এসেছে চৌকিদার রামদাসের ছেলে। রামদাস তার সেই আদি অকৃত্রিম হাফ প্যাণ্ট গেঞ্জির উর্দিতে সেজে ডাকবাংলোর বারান্দায়

দাঁড়িয়ে। সিপাহী রাম আজ একটা রঙিন লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি চড়িয়েছে। গলার স্বর ঈষৎ জড়ানো। বোধহয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বোতলটাকে গলায় ঢেলে টাইট হয়ে রয়েছে। এই সময় বাংলোর পূবের বারান্দার কোণে জাকারাণ্ডা গাছটার ডালে একটা পাখী ডেকে উঠল। চাঁদ প্রায় মাথার ওপর। বাতাস সামান্য শীতল।

হাট থেকে দুটো মুরগী আগেই কিনে রেখেছিল রামদাস। দাম বলল, পঁচিশ টাকা। দামটা আদায় করে চলে গেলেন ডিনার বানাতে। কিন্তু আগাম টাকা ও পেল কোথায়? সে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। এই জঙ্গলের পি সি সরকার চৌকিদার রামদাস পারে না এমন কোন কাজ নেই। যা চাও তাই পাবে তবে দক্ষিণা ঠিকঠাক বুঝিয়ে দেওয়া চাই।

প্রসাদ আমাদের স্যুটকেশ দুটো ঘরে তুলে দিল। সিপাহী রাম তিনটে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল ঘর থেকে পূবের বারান্দায় নিয়ে সাজাল। গুঙ্গা ছেলেটা এসে চুপচাপ বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ খুটছিল। এক ধমকে তাকে বিদেয় করে ছাড়ল সিপাহী রাম।

—দেখতে পাচ্ছিস সাবরা টায়ারড, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভাগ।

তুলসী মাহাতোও বনের সিপাহী। তবে নেহাতই দেহাতী। এই পার্থক্যটা রাম সুযোগ পেলেই দু-চারটা ইংরাজির ফোড়ন দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়ে। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল: একদম খাঁটি জিনিস। আনব সার?

দশ টাকায় পাঁচ বোতল মহুয়া। প্রসাদ তার ভাগেরটা আগে ভাগেই চেয়ে নিয়ে গেল। খবরটা রাম দিল। ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে ভাজা মুরগী দিয়ে মহুয়া। সিপাহী রামের গলাটা কেমন ভেজা ভেজা, উদাস উদাস। জানেন সাব, গত রাতে এক জোড়া সম্বর এসেছিল। দু পহরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পিসাব করতে বাইরে বেরিয়ে দেখি এই বহেড়া গাছের নীচে কারা যেন খুটুর খুটুর করছে। ভাবলাম কিনা কি। সনদ হোল। এগিয়ে দেখি এক জোড়া। ওরা তো বহেড়া খেতে দারুণ ভালবাসে।

—কি মনে হয়, আজো আসবে? নির্মল টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে হাফশোয়া অবস্থায় জানতে চাইল।

—মনে তো হয় আসবে।

—আর কোন জন্তু জানোয়ার এদিক সেদিক বেরোচ্ছে?

—বেরোচ্ছে স্যার। কাল দুপুরে বানারী নালার সাইডে ডিউটি দিচ্ছিলাম। দেখলাম বাইসনের ঝুন্দ চরছে। ঝুন্দে কচিকাচা মাদী মরদ মিলিয়ে প্রায় বিশ-বাইশটা। আর কি সাইজ। কি জেল্লা! চোখ জুড়িয়ে যায় সাব। এ আপনার বেতলার টুরিস্ট-পোষা বাইসন নয়, একজন জঙ্গলের খাঁটি আসলি চীজ।

—কাল দেখাতে পারবে?

—থাকলে স্যার নিশ্চয় পারব।

—যদি পার বকশিশ পাবে।

বকশিশের কথায় যেন রামের চোখ জোড়া চকচক করে উঠল। এক ঢোকে একটা গ্লাস সাফ করে দিয়ে বলল: একটা রিকোয়েস্ট করব স্যার?

—বল।

—এখানে আপনারাও জমি নিন না। অ্যান মেমসাহেবের মত কুঠী বানিয়ে লিন। কলকত্তা থেকে টুরিস্ট লিয়ে আসুন। মোটা টাকা কামাবেন। আমাদেরও দু-চার পয়সা আমদামী হবে।

নেশাটা বেশ জমেছে বোঝা যাচ্ছে। নির্মলও সিপাহী রামের প্রস্তাবে বেশ আগ্রহী। বলল, যদি এই ডাকবাংলোর আশপাশে দিতে পারো তো একবার চেষ্টা করে দেখি।

—হা, হা কেন পারব না। রাস্তার উল্টো পিঠেই আমার নিজের তিন বিঘা আছে। আপনারা যদ্দি লেন তো এক বিঘা জলের দরে ছেড়ে দেবো।

—কত পড়বে?

—হাজার টাকা চাইলে এখুনি পাই, তবে আপনাদের জন্য আটশোয় বিঘা দেবো।

ব্যাপারটা সিরিয়স হয়ে উঠছে দেখে বাধা দিলাম: টাকা না হয় জোগাড় হবে কিন্তু আদিবাসীদের জমি তো বাইরের কেউ কিনতে পারে না রাম। গভরমেণ্ট অ্যালাউ করবে না।

—সে সব হামার রেসপনসিবিলিটি। আমি হাওলাত নিচ্ছি, জমি বন্ধক রেখে। কোন শালা কানুন দেখাবে।

বুঝলাম সিপাহী রাম ঝামেলায় আছে। নিশ্চয় টাকা-কড়ির টানাটানি চলছে। নইলে এত অল্প পরিচয়ে প্রয়োজনের প্রসঙ্গ টেনে আনবে কেন। হয়তো অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা। যা মাইনে পায় তাতে চলে না। ধার দেনা করে ফেলেছে। তাগাদা আর ফেস করতে পারছে না। চাইছে কোন

জায়গা থেকে এক লপ্তে মোটা টাকা পেলে তা দিয়ে খুচরো ধার দেনা শোধ করে একটু নিশ্চিন্ত হয়।

—ফরেষ্ট গারডের মাইনে কত রাম ?

—হামি তো সিনিয়র। এখন পাই ঢাই শ টাকা। সিপাহী রামের মর্যাদাবোধ প্রখর। মাইনের কথাতেই শুনিয়ে দিল সিপাহীকুলে একেবারে কুলতিলক। তাই জিজ্ঞাসা করলাম —তোমার আণ্ডারে কজন কাজ করে ?

বেশ ভার-ভারিক্কি চালে বলল, এই ডাকবাংলোর সবাই হামার আণ্ডারে। গারড তুলসী মাহাতো চৌকিদার রামদাস সব।

শহুরে সাহাবদের কাছে নিজের স্ট্যাটাসটা খোলসা করতে পেরে বোধহয় একটু তৃপ্তি পেয়েছে। তার ওপর আকণ্ঠ তৃপ্ত হয়েছে। খানিক বাদে দেখি সিপাহী রাম নির্মলকে জড়িয়ে ধরে গদগদ হয়ে বলছে, টাকাকড়ি চাই না সাব। আপনি লিয়ে লিন আমার জমি। একটা মকান বানান। টুরিস্টরা আস্থক! বেতলার চেয়ে অনেক ভাল এ জঙ্গল। জানোয়ার সব চারিদিকে কিলবিল করছে। বিয়াস সিং কি আর জানোয়ার দেখাবে, সিপাহী রাম আপনাদের আশীর্বাদে দশগুণ জন্তুর খোঁজ রাখে। একটা চান্স দিন স্যার, সিরিফ একটা চান্স। বিশ বছর হয়ে গেল ফরেস্ট গারডের চাকরিতে—নো প্রমোশন। আর বিয়াস সিং বারো বছরের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় উঠে গেল! সবই নসিব। একটা চান্স পেলে হামিও দেখিয়ে দিতে পারতাম।

রীতিমত এক সীন। নির্মল যত গলা থেকে ওর হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে তত আরো শকত করে ওকে জড়িয়ে ধরে। চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। নাকটাও ভারী হয়ে উঠেছে। একটা চান্সের অভাবে একটা জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। বড়লোকের ছেলে বলে বিয়াস সিং লেখাপড়া করার বেশি স্থযোগ পেয়েছে, ওপর মহলে খাতির পায়—নইলে সিপাহী রামের সঙ্গে তফাৎ কোথায়। কাজটা তো জঙ্গলের। আর রেঞ্জার বলুন' ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ারডেন বলুন বা ডি এফ ও-ই বলুন, ওরা কেউ কিসস্থ না শুধু ওপর থেকে ছড়ি ঘোরায়। আসল কাজটা তো করে ফরেস্ট গারডরা। তাদের দিকে কেউ তাকায় না। তাদের কথা কেউ শোনে না। এতদিন বাদে একটা সমঝদার আদমী সিপাহী রাম খুঁজে পেয়েছে নির্মলের মধ্যে। দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। মুখে শুধু একটাই কথা—একটা চান্স স্যার। শুধু একটা চান্স।

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বাঝিয়ে, চান্সের আশ্বাস দিয়ে কোন রকমে ওকে

বিদেয় করলাম। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। আজ আর ঘুম হবে না। দুটো আড়াইটে নাগাদ সম্বর জোড়া আসতে পারে। বারান্দায় বসে চাঁদের আলোয় কয়েক হাত ডিসটানসের ভেতর সেই অলৌকিক দৃশ্য না দেখে কি থাকতে পারা যায়। তবে খানিকটা গড়িয়ে নিতের পারলে ভালো হোত। রামদাস এল গ্লাস, প্লেট বোতলগুলো তুলে নিতে। হঠাৎ নির্মল প্রশ্ন করে বসল : এ রামদাস, তুম সিপাহী রামকো নোকর হো ?

সঙ্গে সঙ্গে চেরো চৌকিদারের কুঁতকুঁতে চোখ দুটো কুঁচকে উঠল : নেহি তো। কোন বালা ?

—কেন সিপাহীজী তো বলল, ও সিনিয়র, তোমরা সবাই ওর আণ্ডারে।

—আণ্ডারকা আণ্ডা। রামদাস বারান্দার বাইরে পিচ কেটে বলল, চলিয়ে না মেরা সাথ। ওর কোয়ারটার আর আমার কোয়ার্টারে কোন ফারাক আছে কিনা দেখবেন। আর ও যেমন ঢাই শ রূপেয়া কিরায়া পায় আমিও তাই পাই। এই বাংলোর যত সাহাব আসে সবাই রামদাসের কাছেই খাতায় সই করে, একস্ট্রা দিন হলে বাড়তি টাকা রামদাসকেই জমা দিয়ে যায়। সিপাহী তো বনে বনে উল্লু কা মাফিক ঘুরে বেড়ায় রামদাস তা করে না। সে ডাকবাংলোর চৌকিদার। কেউ বলতে পারবে, কেউ কোন দিন রামদাসকে বনে-জঙ্গলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে ? বলুক।

এ গভীর মর্যাদার প্রশ্ন। চৌকিদার না সিপাহীজী—কে বড় ? এসব প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া পরশু সকালের আগে যখন এই বাংলো ছাড়ছি না তখন মিথ্যে মিথ্যে রামদাসকে চটিয়ে কি লাভ। বরং একটু তোয়াজে রাখলে বাকি দিনটা ভালভাবেই কাটবে। নির্মলকে মুখ খোলার আর স্কোপ দিলাম না। বললাম, রামদাস এই বাংলোর কাছে পিঠে একটা মকান বানিয়ে টুরিস্ট আনতে পারলে ব্যবসা জমবে ?

: জমি কোথায় পাবেন ?

: কেন সিপাহী রাম এক বিঘা জমির বন্দোবস্ত করে দেবে যে বললো।

: শালা মাতাল, ডাকু। সব সাহাবকে এই কথা বলে বিশ-পঁচিশ যা পায় হাতিয়ে নেয়। ও জমি দেবে কোথা থেকে ? শালার কিচ্ছু নেই। যা ছিল সব মহাজনের কাছে বাঁধা। খবরদার, ভুলেও ওর খপ্পড়ে পড়বেন না। সত্যি যদি আপনারা এই জঙ্গলে টুরিস্টদের জন্য মকান বানাতে চান, তাহলে আমাকে বললেন। হামি জমির বন্দোবস্ত করে দেবো। ডাল্টনগঞ্জ থেকে আমিনকে আনিয়ে পাকা কারবার হবে। কোন ঝুট ঝামেলা থাকবে না। তবে হাঁ,

আমিন-টামিনের জন্য আগাম পঞ্চাশ টাকা লাগবে। চৌকিদার রামদাস কোন ঝুট ঝামেলা করেও না, চায়ও না।

প্লেট, গ্লাসট্‌্লাস নিয়ে রামদাস চলে যেতে আমরা দুজনে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলাম। হো হো করে। ঘুমটুম সব কেটে গেছে। এত মজা বহুদিন পাইনি। রামদাস আর সিপাহী রামের মর্যাদার লড়াই নির্জন এই ডাক-বাংলোটাকে দারুণ ইণ্টারেস্টিং করে তুলেছে। এখনো কানে বাজছে রামদাসের শেষ কথাগুলো: চৌকিদার রামদাস পারে না এমন কোন কাজ নেই। যদি চান আজ রাতেই সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। তবে পুরা টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এই রাতে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকে কি করে ও আমিনকে নিয়ে আসবে? এই রাতে জমির মাপ-ঝোকই বা হবে কি করে? নির্মল পারসটা বার করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলল, এই নাও। যদি পারো তাহলে আরো পঞ্চাশ টাকা পাবে।

রামদাস চলে গেছে টাকা নিয়ে। নির্মলকে ধমকালাম, তুই মিথ্যে মিথ্যে পাগলামিকে প্রশ্রয় দিলি। মাঝখান থেকে টাকা কটা গচ্চা গেল।

—দাঁড়া না। দেখি না ওর দৌড় কতটা। হয়ে যাক আজ রাতেই দুই গ্রেটম্যানের গ্রেটনেসের মীমাংসা। রামদাস না সিপাহী রাম—কে বড়।

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নের কংক্রিট সলিউসনের আশায় সেই থেকে দুজনে এই বারান্দায় বসে আছি। সামনে টিলার ঢাল বেয়ে গড়ানে বিশাল মাঠটা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় কুয়াশার মত চাঁদের আলো। শাল, শিমুল, মহুয়া, পলাশ, বহেড়ার ডালপালা ঝিম ধরে আছে। থেকে থেকে একটা পাখী ডেকে উঠছে। এই রাতে এক জোড়া সম্বর আসবে, বহেড়ার ফল খেতে। আমিন এলে ফিতে চেইন নিয়ে আমরা মাঠে নেমে যাব, ভবিষ্যৎ টুরিস্ট লজের জমির মাপজোক সেরে রাখতে। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে উত্তেজনা কেটে গিয়ে ঘুম পাচ্ছে। চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ। সম্বর এলে দেখতে পাবো না। আমাদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে, কাল সকালেই রামদাস বলবে, আমিন চটেমটে চলে গেছে। মাঝখান থেকে টাকা কটা বরবাদ হয়ে যাবে। তাই জোর করে চোখ্‌ খুলে বসে আছি। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি। রাত একটা বেজে গিয়েছে। আরো ঘণ্টাখানেক আগে সম্বর আসবে না। একটানা কয়েক দিন ফারনেসের আগুনে ঝলসানোর পর আজকের এই ঠাণ্ডা রাতে মনে

হচ্ছে যেন কোন এয়ার কনডিশন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছি। চাইলেই কি ঘুম ঠেকানো যায়?

অনেকক্ষণ ধরে খুটুর খুটুর একটা আওয়াজ কানে আসছে। যেন খুব কাছেই কে বা কারা ঘুরঘুর করছে। তবে কি সম্বর দুটো বারান্দায় উঠে এসেছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ খেয়াল নেই। কোথায় সম্বর? বহেড়া গাছটা আগের মতই তেমনি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে চাঁদ আগের মতই নিয়মের আলো ছড়াচ্ছে! দূরে শাল, শিমুল, পলাশের মাঠন তেমনিই পড়ে রয়েছে। তবে আওয়াজটা এলো কোথা থেকে?

—এ বাবু।

এই মুহূর্তে যদি কেউ রিভলবর উঁচিয়ে বলত হ্যাণ্ডস আপ, তাহলেও বোধ হয় এতটা অবাক হতাম না। এই গভীর রাতে এই নির্জন ডাকবাংলোর বারান্দায় মেয়েলোকের গলা? মুখ ঘুরিয়ে দেখি আমার আর নির্মলের চেয়ারের পেছনে দুটি আদিবাসী মেয়ে দাঁড়িয়ে। নির্মলেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল: কি রে আমিন, বেটা এসেছে?

—একটা না দুটো।

—সে কি রে। কোথায়?

—তোর পেছনে।

দু দিক থেকে দুটো মেয়ে ততক্ষণে আমাদের চেয়ারের কাছে সেঁটে এসেছে। অসম্ভব রোগা, পোড়া কয়লার মত বিবর্ণ পরনের শাড়ি শত ছিন্ন। আমাদের ভোলানোর জন্য দাঁত বার করে হাসছে। হাসলেও কুণ্ঠিত বোঝা যায়। আমরা কিভাবে নেব তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আমরা গম্ভীর বিস্মিত। তাই বোধহয় ওদের হাসিও মুছে গেল। অস্বস্তিকর যেন বুঝে উঠতে পারছে না এই বাবু দুটো কি করবে। কি বলতে চায়?

রামদাস রিয়েল চৌকিদার। শুধু ডাকবাংলোর নয়। আশপাশের গাঁয়ের। নইলে এই রাতে নিশ্চয় ওর ধারণা হয়েছে আমিন শব্দটা আমরা কোড হিসাবে ব্যবহার করেছি। এক এক বাবুর এক এক রকম রীতি-ব্যবহার। কেউ খোলাখুলি কাজ করতে ভালোবাসে, কেউ আড়ালে, আবডালে। ঢাকাঢুকি দিয়ে। সকলেরই হার্টের প্যালেপিটেশন নাড়ির গতি রামদাসের মুখস্থ। জঙ্গলে ঘুরে জন্তু দেখে বেড়াচ্ছো না, জানি না তোমরা বাবুরা কেন জঙ্গলে আসো?

কবুল করতে কোন লজ্জা নেই—ঘুরতে ঘুরতে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল না। দুটো ব্যাটাছেলে সারাক্ষণ মুখোমুখি—বোটানিস্ট বা জুওলজিস্ট হলেও না হয় কথা ছিল। কেন এসেছি জঙ্গলে? কলকাতাই বা কেন ছেড়ে এলাম? চারিদিকে কামানো না কামানো দাড়িওয়ালা মুখ, বাঁধাধরা বিবাহিত সেক্স—এক অসহ্য ব্যাপার। একটি মেয়ে সটান আমার কোলের ওপর বসে পড়ল, পিঠটা হেলিয়ে দিল আমার বুকে। হিন্দীতে ফিস ফিস করে বলল—ঘরে চ বাবু।

আর একটি মেয়ে নির্মলের বুকের ওপর আধশোয়া অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল।

জানতে চাইলাম, তোদের খবর দিল কে?

—কেন চৌকিদার।

—তোরা কি নিজেরা আসিস?

—চৌকিদার বললে আসি, বাবুরা চাইলে আসি।

— কত পাস?

—পাঁচ টাকা।

—কি করবি টাকা দিয়ে?

—কাল ছিপাদহ হাটে যাব। চাল, ডাল কিনব, কাঁচের চুড়ি আয়না, আর চিরুনি কিনব। কপালে টিপ পরব। সাজব।

—মরদ নেই তোর?

—আছে।

—তবে যে ছেড়ে দিলো এই রাতে?

—কি করবে। একটা টাকা কামানোর মুরদ নেই। একটা সিনেমা দেখায় না।

—সিনেমা দেখেছিস কখনো?

—হ্যাঁ। ডাল্টনগঞ্জে। কি দারুণ দেখতে।

—দেখালে দেখতে যাবি?

—লিয়ে চল বাবু। তুদের তো গাড়ি আছে। যাবি আর আসবি। কাল সারাদিন তুদের সঙ্গে থাকব। এক পয়সাও দিতে হবে না।

—কেন পয়সা নিবি না কেন?

—তাই তো নিয়ম। জঙ্গলের ট্রাকওয়ালারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে তুলে লেয়। ডাল্টাগঞ্জে সিনেমা দেখায়, হুটুলে পেট ভরে খাওয়ায়! পরদিন আবার ফেরৎ দিয়ে যায়। এত খরচ-খরচার পর কি আর কিছু চাওয়া যায়।

নির্মল আর ওই মেয়েটি কথা বলতে বলতে বহেড়া গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ছায়া ছায়া বৃক্ষতলে ঠিক যেন এক জোড়া সম্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মচ মচ করে শুকনো পাতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বাতাস হালকা ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ মনে হল, আরো যেন কেউ আমাদের দেখছে। পেছনে চোখ ফেরাতেই গঙ্গার চোখে চোখ পড়ল। বারান্দার ওই কোণটায় চাঁদের আলো পৌছোয়নি। অন্ধকারে এক জোড়া সাদা চোখ আমাদের দেখছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের কৌতুহলী ওই দৃষ্টির সামনে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল। আমার কোলে বসা মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঘুরে বসেছে। আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে ওর বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। সামনের ওই মাঠটার মতই প্লেন। বয়সে যুবতী হলেও যৌবন এসেও আসেনি এই দেহে। ছোট দুটি কুশি আম শাড়ির পর্দায় ঢাকা। কলকাতায় চৈত্র মাসে যে কাঁচা আম দিয়ে বাড়িতে টকের ডাল রান্না করা হয়। ওকে হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, কাল ডাণ্টাগঞ্জে গিয়ে সিনেমা দেখিস, এখন যা।

যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতের মুঠোয় টাকাটা। বড় বড় চোখে শুধু অবিশ্বাস। নাকে একটা দস্তার নথ। আরো ঠেলে এল কাছে—ঘরে চ বাবু।

—ঘরে যাব। কিন্তু তুই আগে বাড়ি যা।

—ক্যানে ?

—আমার দরকার নেই।

—বুলিস কি বাবু ?

—হ্যাঁ রে। যা বলছি তাই কর।

—তবে তুর ট্যাকা আমি নিব না।

—সে তোর যা খুশী তাই কর।

অন্ধকারেও ওর চোখের সাদা কাঁপছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। পুরু ঠোঁট জোড়া কি যেন বলতে চাইছে। হাসিটাসি সব মুছে গিয়েছে। নেতার হাটের আর একটা মুখ আমার ভেতর বার বার জেগে উঠছে। সব ছবিই কি বুকে আঁকা থাকে ? শরীরের নীচে চামড়ার নীচে যেখানে একটা যন্ত্র সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধুকপুক করে সেইখানে ? মুখটা কেমন বিস্বাদ লাগছে। বেশি রাতে খেয়ে হজম হয়নি। ঢেঁকুর উঠছে। জিভটা টক টক। নোটটা দলা পাকিয়ে আমার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে

লাগল মেয়েটি। এত অপমান, যেন এর আগে কেউ কখনো করেনি। কাজ না করে পয়সা? ছিঃ ছিঃ। পারলে যেন থুতু দেয় আমার গায়ে। টাকাটা হাওয়ায় ধাক্কা খেয়ে বারান্দা দিয়ে গড়িয়ে ছুটে অন্ধকারে গেল মিলিয়ে। মেয়েটি আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে বারান্দার সিঁড়ি ভেঙ্গে ঝাকারাণ্ডা গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওধারে নিঃশব্দে চলে গেল। আমি ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম।

ঘুম ভাঙ্গল অনেক বেলায়। সূর্য পঁয়তাল্লিশ ডিগরি অ্যাঙ্গেলে আকাশে। রামদাস চা দিয়ে গেল। ল্যাপাপোঁছা মুখ। যেন কিছুই হয়নি। কাল রাত যেন অন্য যে কোন রাতের মতই ঘটনা বিহীন। এই জঙ্গলে আবার ঘটনা কোথায়। নির্মল নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। রামদাস জানতে চাইল দুপুরে কী খাব?

বললাম—ভাত আর আণ্ডাকারী।

আজ দুপুরে আর বেরোলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে বসে দুজনেই দুটো বই পড়ছি। সিপাহী রাম একবার এসেছিল। বলে গেছে বাইসনের ঝুন্দের তল্লাসে যাচ্ছে; দেখা পেলেই খবর দেবে। পাঁচটা টাকা আগাম বকশিশ নিয়ে গেছে। ওর চাই টাকা, তুলসী মাহাতোর চাই টাকা। জমির ব্যাপার নিয়ে নির্মলকে কয়েকটা জরুরী কথাও জানিয়ে গেছে। আজ আর জমি নিয়ে নির্মলের বিশেষ উৎসাহ নেই। মন দিয়ে প্যাপিলন পড়ছে। প্রসাদ সকাল থেকে একবারও দেখা দেয়নি। গত কয়েকদিনের যা ধকল গেছে। তবু গোড়ার সেই রাগ রাগ ভাবটা ওর আর নেই। এখন ওর চাউনী অনেকটা সরল। বোধহয় নিরুপায় হয়েই আমাদের মেনে নিয়েছে। তাছাড়া মোটা বকশিশ নিশ্চয় পাবে—এ আশাটা এখন প্রবল। আর তো মোটে একটা দিন। কাল সকালেই আবার রাঁচির পথে। কাল রাত নটায় কলকাতার ট্রেনে।

সাড়ে তিনটে নাগাদ ছুটতে ছুটতে এল সিপাহী রাম। বাইসনের খোঁজ মিলেছে। এখুনি চলুন। বামারী নালার ধারে ঘুরছে। সিপাহী তুলসী মাহাতো নজর রাখছে।

গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছিল না। নির্মল, রাম ও আমি তিনজনে জোরে ধাক্কা দিতেই গর্জে উঠল। লাফ দিয়ে ঢুকে বললাম, প্রসাদ জোরসে চালাও।

দুপুর থেকে এই ঠাঠা পোড়া রোদে ঘুরে ঘুরে কি করে বাইসনটাকে খুঁজে বার করেছে তারই ফিরিস্তি নাগাড়ে উগড়ে যাচ্ছে সিপাহী রাম। এটা

একটা নরবাইসন। ঝুন্ড থেকে ছিটকে পড়েছে। ঝুন্দটা বোধহয় চরতে চরতে ছিপাদহ ছাড়িয়ে গাঙুর দিকে চলে গিয়েছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। খাঁটি জংলী বাইসন সাহেবদের দেখাবে বলে কথা দিয়েছিল, সেই কথা রাখতে পারছে বলে ওর মুখ থাকছে। শুধু বিয়াস সিংই জানোয়ার দেখায় এটা ঠিক নয়। সিপাহী রামও পারে। তার বিয়াসের মত জিপ নেই, স্পট লাইটও নেই। খালি হাতে, পায়ে হেঁটে কাজ করতে হয়।

সামনে রাস্তাটা নীচু হয়ে একটা নালার কজওয়ের দিকে গড়িয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। কজওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তুলসী মাহাতো গামছা নাড়ছে। গাড়িটা রাস্তার ধারে রেখে আমরা তুলসীর পেছন পেছন ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকলাম। নালার মরাখাত জুড়ে শুধু বালি, মাঝে মধ্যে ছোটবড় পাথর। খাতের পাশ দিয়ে বড় বড় শালগাছ সটান আকাশে উঠে গিয়েছে। শুকনো কালো, নিপত্র খয়ের ও শিমুল গাছ এধারে ওধারে ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের ঝাড়। দুই বন-সিপাহী দুদিক থেকে জঙ্গলে ঢুকছে। একটু আগেই বাইসনটা এই জঙ্গলে ঢুকেছে। সিপাহী রামের পেছনে আমরা। টিপে টিপে হাঁটছি। যাতে কোন আওয়াজ না হয়। কিন্তু ঝরা পাতার চাদরে পা পড়লে শব্দ না হয়ে উপায় কি। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শীষ জঙ্গলে গাছে গাছে ধাক্কা লেগে রাস্তার দিকে ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী রাম ওই শীষের উৎস লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখি শখানেক গজ দূরে তুলসী মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিটি-মারার পোজে দাঁড়িয়ে। আমাদের ডাকছে। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে মরা পাতা পাড়াতে পাড়াতে এগোতে লাগলাম।

একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দু জোড়া ধবধবে সাদা মোজা পায়ে। কুচ-কুচে কালো দেহটা যেন গর্জন তোলে পালিশ করা। পিঠটা কাঁচের মত। বিশাল দুটো শিং বাঁকা চাঁদের মত অর্ধ বৃত্ত রচনা করে। তরোয়ালের মত তীক্ষ্ণ। দেখবার মত জন্তু। যেমন বিশাল, তেমনি গর্জাস।

—আর একটু কাছে গেলে হয় না? নির্মল ফিস ফিস করে বলল। জন্তুটা প্রায় সত্তর-আশী হাত দূরে।

—চলুন না। উৎসাহ দিল সিপাহী রাম। তবে সাবধান, যদি ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটবেন। একদম সোজা রাস্তায়।

আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। যতটা সম্ভব শব্দ না করে। যত গোল এই মরা পাতাগুলো নিয়ে। হালকা করে পা রাখলেও মচমচানির কামাই নেই। বাইসনটা বোধহয় টের পেয়েছে। বাঁশ ঝাড়টা কাপিয়ে দিয়ে আর

একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল একটা কালো কুষ্ঠি পোড়া খয়ের গাছের নীচে। আমরাও পেছন পেছন যাচ্ছি। এবার যেন বিরক্ত হয়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করল। তারপর আবার বিরাট দেহটা নিয়ে আরো ওপাশে সরে গেল। ওদিকে তো রাস্তা। যদি একবার রাস্তায় ওঠে তাহলে ফুল ভিউটা পাবো। আপশোষ হচ্ছে সঙ্গে একটা ক্যামেরা নেই।

সত্যি সত্যি বাইসনটা রাস্তায় গিয়ে উঠল। সিপাহী রাম তাড়া লাগাচ্ছে, চলিয়ে চলিয়ে সাব, তুরন্ত চলিয়ে। এবার আর আওয়াজের তোয়াক্কা না করে পাতা বালি, মরা গাছের গুড়ি, পাথরের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠলাম। বিরক্ত জন্তুটা রাস্তা ছেড়ে উল্টো দিকের জঙ্গলে নেমে যাচ্ছে। শালের জঙ্গল। মাঝে মধ্যে কুসুম গাছ। দু-একটা ধাউ আর চিলবিল। এধারে বাঁশ ঝাড় বিশেষ নেই। গাছগুলোও ফাঁক ফাঁক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বেশ মজা লাগছে। লোকে ওকে ভয় পায়, আর ও কি না আমাদের ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ বাইসনটা যেন খেপে উঠল। টের পাচ্ছে ওর অনুসরণকারীরা এখন রাস্তা ছেড়ে এ ধারের জঙ্গলে আসছে। ওর যেন সহ্য হচ্ছে না। একেই দলছুট। ওধারটায় তবু খানিকটা চুরানট ঘাস ছিল। এদিকে ঘাসটাস কিচ্ছু নেই। বাইসনটা এবার আর হাঁটা নয় রীতিমত দৌড়তে লাগল। পেছন পেছন আমরা। মাত্র চার-পাঁচ গজ ছুটল। তারপরই দেখি ওর সামনের পা দুটো শূন্যে উঠেই নীচে নেমে গেল, তার ওই বিশাল দেহটা সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কি ব্যাপার? থমকে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল দুই বন সিপাহীর আর্তনাদ: খাদ মে গির গিয়া, খাদ মে গির গিয়া। রাম ও মাহাতো দুজনে পাগলের মত ছুটে গেল ওই দিকে। সেই সঙ্গে আমরাও।

গিয়ে দেখি বিশাল লম্বা একটা ট্রেনচ। দেড় মানুষ সমান গভীর। প্রায় পাঁচ হাত চওড়া। রাস্তার প্যারালাল দুদিকে নালার মত কাটা। জঙ্গলের আদিবাসী গ্রামের ক্ষেতের ফসল বুনো হাতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই ধরনের ট্রেনচ সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে। গাছপালার আড়ালে বলে রাস্তা থেকে ঠাহর হয় না। বাইসনটা ঘাড় মটকে পড়ে আছে। ডানদিকের শিংটা পাথুরে মাটির ভেতর গেঁথে গিয়েছে। গোঙানি ওর গলা ঘিরে বেরুচ্ছে। হা ঈশ্বর। একি সর্বনাশ হল। এ তো আমরা চাইনি। আমরা জানোয়ার দেখতে এসেছিলাম একটা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি সিপাহী রাম কাঁদছে। বললাম কাঁদছ কেন। কিছু হয়নি। কোন

রকমে ওর পাগুলো যদি ছাড়িয়ে দিতে পার, তাহলেই আবার উঠে দাঁড়াবে।

কাঁদতে কাঁদতে বলল—বিয়াস সাব জানতে পারলে আমার চাকরি খতম করে দেবে।

বললাম—কেউ জানবে না। এক কাজ কর। আমাদের গাড়িটা নিয়ে বেতলায় চলে যাও। লোকজন লাগবে। দড়িটড়ি লাগবে। বিয়াস সিংকে খবর দাও। ওই এসে সব ব্যবস্থা করবে। আমরা আর তুলসী মাহাতো ততক্ষণ এখানে আছি।

কিছুতেই যাবে না। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে পাঠালাম। ঘড়িতে এখন বাজে বিকেল সোয়া চারটা। বারো কিলোমিটার যাবে বারো কিলোমিটার আসবে আর খবর দিতে বড় জোর পাঁচ মিনিট। নিশ্চয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বিয়াস চলে আসবে।

তুলসী ওর হাতের টাঙি দিয়ে একটা শিশু শাল কেটে ফেলল। মোটা খুঁটি। তাই দিয়ে ওপর থেকে বাইসনটার সামনের দুটো পায়ের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিতে লাগল। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজ থেকে সামনের বাঁ-পাটা বেরিয়ে আসছে। কালো হাঁটু বেয়ে গল গল করে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে। সাদা মোজা পরা পায়ের নীচের অংশটুকু রক্তে মাখামাখি। থেকে থেকে সেই করুণ গোঙানি। জিভটা বেরিয়ে আছে। বাঁ চোখটা স্থির দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে। পেছনের পা জোড়া নিজেই ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। পারছে না। বারণ শুনল না নির্মল। একটা কাটাগাছের ডাল ধরে ঝুপ করে নেমে পড়ল খাতে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বাইসনটার পেছনের পায়ের দিকে। তুলসী আর একটা শিশু শাল গাছ কেটে নির্মলের হাতে তুলে দিল। পেছনের দুই পায়ের ভেতর ঢুকিয়ে খুঁটিটা ওপরের দিকে আস্তে আস্তে ঠেলে তুলে চাপ দিতেই পেছনের বাঁ পাটা খাঁজ থেকে বেরিয়ে এল। পাথরের খাঁজে খানিকটা কালো চামড়া, মাংস, রক্ত চাপ ধরে রয়ে গেল।

তুলসী ততক্ষণে আর একটি পা ছাড়িয়ে দিয়েছে। এবার দুজনেই নীচে নেমে পেছনের ডান পাটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। অদ্ভুত ব্যাপার জন্তুটা কোন চেষ্টাই আর নিজে থেকে করছে না। ওর গোটা দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। মনে হল জল চাইছে। কোথায় পাব? নামেই বামারী নালা—এক ফোঁটা জল নেই। শুকিয়ে খট খট করছে। দেখি যদি কোথাও পাই। হাটতে হাঁটতে রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। ছিপাদহর দিকে। যদি কোন ট্রাক

বা লরি দেখতে পাই, ওদের কাছে বালতি ভর্তি জল থাকে ইঞ্জিনের জন্য চেয়ে নেব। কিন্তু কোথাও কোন গাড়ির টিকিও দেখতে পাচ্ছি না। ভেতরে ভেতরে অসহ্য লাগছে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী লাগছে। যদি বিয়াস জানতে পারে, কারা এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী। ফাদার চাকোর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ভজানো, পটানোর সব রকম চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। বিয়াস ছাড়েনি। দাঁতে দাঁত চেপে বার বার বলছে: একটা বাইসন তুমি খুন করবে আর আমি তোমায় ছেড়ে দেবো। কবভি নেহি। নিজেই ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলাম।

মাঠঘাট, বন-বাদাড় পুড়িয়ে খাঁক করে পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঘড়িতে চোখ পড়তে দেখি সোয়া পাঁচটা। সামনে রাস্তা দুভাগ হয়ে পড়ে রয়েছে। ডানদিকের মেঠো পথ সোজা চলে গেছে ছিপাদহ হাটের দিকে। বাঁদিকের পিচ রাস্তা রেল গুমটি পেরিয়ে সোজা মহুয়া-দাঁড়ের পথে। একটাও লরি বা ট্রাক দেখলাম না। প্রায় দু কিলোমিটার হেঁটে এসেছি। জানি না তুলসী নির্মল এতক্ষণে কিছু করে উঠতে পেরেছে কিনা? ফেরা যাক। দ্রুত পা চালাতে লাগলাম!

ফিরতে ফিরতে আলো কমে এল। সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে দু ধারে জঙ্গল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনেই বামারী নালা। আমাদের অ্যামবাস্যাডারটার পাশে দুটো জিপ দাঁড়িয়ে। ছুটতে শুরু করলাম। গাড়ির কাছে এসে দেখি ট্রেনচটার সামনে একটা ছোটখাট ভিড়। বিয়াস দাঁড়িয়ে আছে। ওর চার ধারে জলপাই রংয়ের উর্দি পরা ডজনখানেক বন সিপাহী। ওই ভিড়ের মধ্যে তুলসী ও রাম হাতে দুটো শাল খুঁটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই চুপচাপ। কি হল? তাড়াতাড়ি ট্রেনেচের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উল্টো দিকে নির্মল। ওর চোখ জোড়া খাদের অন্ধকারে নামানো। আমি ওই অন্ধকারে তাকালাম। দুজন চামার মন দিয়ে জন্তুটার ছাল ছাড়াচ্ছে।

নির্মল প্রথম মুখ খুলল: বাঁচানো গেল না রে। বিয়াস এসে পৌঁছোনোর খানিক আগেই শেষ হয়ে গেল। মরার আগে খুব গোঙাচ্ছিল। বোধহয় তেষ্টা পেয়েছিল।

—আমি তো জল আনতেই গিয়েছিলাম। তা একটাও লরি বা ট্রাক পেলাম না রাস্তায়।

—জল দিলেও ওকে বাঁচানো যেত না। ওর ঘাড়টাই ভেঙ্গে গেছে। বিয়াস চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল। বয়স হয়েছিল।

বোধহয় চোখে দেখতে পায়নি। বেশী বয়সে মেল বাইসন অন্ধ হয়ে যায়।

বিয়াসের শেষ কথা কটায় যেন একটু স্বস্তি পেলাম। তাহলে আমরা নই, ওর অন্ধত্বই দায়ী। জিজ্ঞাসা করলাম, একটা বাইসনের আয়ুর গড় কত?

—জেনারেলি বিশ-বাইশের বেশি এরা বাঁচে না। এই বাইসনটার শিং-এর রিংগুলো গুনে মনে হচ্ছে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে।

—এটা কি মেল?

—হ্যাঁ এটা মেল বাইসন।

—চামড়া ছাড়াচ্ছে কেন?

—বেতলার মিউজিয়ামে এটাকে স্টাক করে রাখা হবে। খুব ক্যাজুয়ালি কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিয়াসের গলার স্বর বদলে গেল। এতক্ষণে হিন্দীতে বলছিল। এবার ইংরাজিতে বলল, কৌতূহল ভালো, কিন্তু বাড়াবাড়ি ভালো না। একটা নিরীহ অন্ধ বস্তু কৌতূহলের খেসারত দিল প্রাণ দিয়ে।

তবে কি বিয়াস সব জেনে গিয়েছে? কে বলল? সিপাহী রাম? তুলসী মাহাতো? ওরা কেন বলবে। তাহলে ওদেরও দোষ প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে কি নির্মল সব বলে গিয়েছে? না, নির্মলের চোখে চোখ রাখতেই বুঝতে পারলাম—ও ঠিক আমারই মত বিস্মিত। বিয়াসের চোখ জোড়া একবার নির্মলের একবার আমার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। পাইথনের স্থির লক্ষ্য ওই চোখে। মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই দেখি প্রসাদ মুচকি মুচকি হাসছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল। গত কয়েকদিনের নাকানি-চোবানির শোধ আজ ও তুলবেই। পাথরের ডান চোখটা অনড়, বাঁ চোখটা যেন বিষ উগরে দিচ্ছে। একমাত্র নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। যে সব দেখেছে, সব জানে। হয়তো বেতলায় আড়ালে গিয়ে সব বলেও দিয়েছে। নইলে এই ঘটনার পর কারো মুখে হাসি লেপ্টে থাকে?

দুটো বড় বড় টর্চ ওপর থেকে ধরে রাখা হয়েছে। নীচে দু জোড়া হাত নিপুণভাবে চামড়া সরিয়ে থাক থাক চর্বি, মাংস কেটে কেটে পেছনে টাল দিয়ে সাজাচ্ছে। জন্তুটার বাঁ চোখটা স্থির হয়ে রয়েছে, ঠিক যেন প্রসাদের পাথরের চোখের মত। এখন আমরা কী করব? ফিরে যাব খেড়ের ডাকবাংলোয়? কালই আমাদের চলে যাওয়ার কথা। বিয়াসকে কথাটা একবার বলা দরকার। তারপর ও যা ভাল বোঝে করুক। বিয়াসের দিকে তাকাতেই দেখি একজোড়া চোখ সোজা আমার মুখের ওপর। অন্ধকারেও

জলছে এই চোখ কোন বুনো জন্তুর আততায়ীকে মাপ করে না। করভি-নেহি।

গরুমারার জঙ্গলে

জঙ্গলে বেড়াতে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গে। গরুমারা। হরিণ, সম্বর, বাইসন, আর কপাল ভাল থাকলে নাকি দৈবাৎ গণ্ডারেরও সাক্ষাৎ মেলে। চিড়িয়াখানায় চিড়িয়া দেখা এক জিনিস আর জঙ্গলে পায়ে হেঁটে, দামের দলে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঘুরে বেড়াতে সেই তাদেরই দেখা সম্পূর্ণ আর এক ধরনের অভিজ্ঞতা! এই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছি সুন্দরবনে, আর পালামৌর জঙ্গলে। তাই শুধু নির্মল যখন প্রস্তাব দিল পুজো আসছে, যাবি না কি। স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রের মত সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বললাম ইয়েস স্যার। তখন কি জানতাম জঙ্গল দেখবার আগেই, জঙ্গলে ঢুকবার আগেই আর এক জঙ্গলে গিয়ে পড়তে হবে। মানুষের জঙ্গল স্যার, মানুষের জঙ্গল। জীব-জন্তু বহু বছর ধরে দেখছি। ওদের জীবনের একটা ছক আছে। সেই ছকে কেউ যদি ঘা না দেয়, তাহলে ওরা পাল্টা আঘাত করে না। কিন্তু মানুষের জঙ্গল—ওরে বাবা। ছক ফক কিসসু নেই। শুধু আঘাত আর আঘাত। মিথ্যে আর মিথ্যে। চারদিকে শুধু ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা আর নিষ্ঠুর ব্যবহার।

হ্যাঁ মশাই খোলাখুলি কথা বলতে আমি ভালবাসি, বলিও। কোন রাখ-ঢোক গুড়-গুড় নেই। অপরাধের মধ্যে মাস কয়েক হল এক বন্ধুপত্নীকে ভালবেসে ফেলেছি। বুঝতেই পারছেন বন্ধুপত্নীটি অপর কেউ নন—নির্মলের স্ত্রী। মহিলা সুন্দরী। ঠিক কেমন সুন্দরী বলা মুশকিল। যদি দেহের বর্ণনা চান, তবে বলব হাইট পাঁচ ফুট দেড় কি দুই। পায়ে আরো ইনচি তিনেকের হিল তোলা চপ্পল। গায়ের রং মাখম মাখম। চোখটা মুরগীর ডিমের মত। তবে কালো মণির দু-ধারে হলদে ছিট ছিট। বোধহয় কিডনীর ট্রাব। মাথায় চুল ঘাড় অবধি ছাঁটা। টান টান করে আঁচড়ে রবারের গার্ডার দিয়ে অশ্ব-পুচ্ছের মত সদা সর্বদা ঝোলানো। নাকটা টিকোলো। ঠোঁট একদা ছিল গোলাপী। দীর্ঘদিন ধরে লিপষ্টিক ঘষার ফলে এখন কেমন যেন ঝরা পাঁপড়ির মত। গাল দুটো টাবলা টাবলা। তবে হাসলে সাদা দাঁতের সারি

অসম্ভব সুন্দর। কথায় কথায় বলে বিয়ে করেছি বলে সে আর দাসখৎ লিখে দিই নি আর তা দেয় নি বলেই, একটা স্কুলে পড়ায়। শ্বশুর বাড়ি থেকে স্কুল ঠিক সিকি কিলোমিটার। গাড়ি করে যায়, গাড়ি করে আসে। হাঁটলে নাকি বিগ একজিকিউটিভ শ্বশুরের ইজ্জৎ নষ্ট হয়। সপ্তাহে তিন দিন অর্ঘ্য সেনের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখে। সম্প্রতি গাড়ি চালাতে শিখেছে। চার বছরের একমাত্র ছেলেটিকে বাড়ির চাকরের কাছে রেখে এইসব শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েই সারাটা দিন ব্যস্ত থাকে। নির্মল সিমেণ্টের ব্যবসা করে। সকাল নটা থেকে রাত আটটা। তারপর ক্যাম্পোজ আর এক বোতল হুইস্কি দিয়ে সারা দিনের ক্লান্তি সেরে যখন বাড়ি ফেরে তখন ত্রিশ বছরের স্ত্রী অনন্যা থাকে ঘুমিয়ে। আর তাতেই আমার সুবিধে। দুই বাড়িতেই ফোন আছে। অনন্যা তার শ্বশুর শাশুড়ি, দেওর, চাকরবাকরদের কান বাঁচিয়ে ফিস ফিস করে বলে, ঘর-সংসার কিছুই জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব নয়, তবু তোমাকে ভালবাসি। আমি আমার স্ত্রী পাঁচ বছরের কন্যা ও বাড়ির ঠিকে ঝির কান এড়িয়ে গলা নীচু করে বলি, এই আটত্রিশ বছর বয়সে একমাথা কাঁচা-পাকা চুল নিয়ে লোক হাসানোর কোন ইচ্ছেই নেই। তবে তোমাকে ভালোবাসি। ভাল লাগে তোমার ঠোঁট, ভ্রূ, চোখের কালো মণি, ঠোঁটের কোণের উজ্জ্বল হাসি, পায়ের নিটোল সুন্দর আঙুলগুলো। চুমু খেতে ইচ্ছে করে। জড়িয়ে ধরে আদর করতে। তাই নির্মল যখন বলল, জঙ্গলে যাবি, তখন এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। বহুদিনের ইচ্ছে টিচ্ছেগুলো হয়তো জঙ্গলের আড়ালে আবডালে একদিন সম্ভব হবে। হা ঈশ্বর তখন কি জানতাম যে ইচ্ছে কখনো পূরণ হয় না।

কেন হয় না—কোথায় গণ্ডগোল হল, সেটাই আগে বলে নিই। গোড়ায় বুঝতে পারিনি যে, আমার স্ত্রী কৌনিক প্রেমালাপটা ধরে ফেলেছে। পেশায় মশাই সাংবাদিক যতক্ষণ বাড়ি থাকি যন্ত্রটা হয় বাজে নয় বাজাই। খুবই স্বাভাবিক। কাজকর্ম না থাকলে স্ত্রী রমণী অনেক সময় পাশে বসে কাগজ বা বই পড়ে। আমিও খেয়াল করিনি। হঠাৎ একদিন প্রথম জিজ্ঞাসা করল : যত ফোন আসে বা কর তুমি তো স্বাভাবিক গলাতেই কথা বলো। কিন্তু আজকাল দেখছি একটা ফোন এলে গলা নামিয়ে ফিস-ফিস কর! কেন?

প্রথম প্রথম চেষ্টা করতাম বোঝাতে, এখনও ফোন আসে, সংবাদের গোপনীয়তা রাখার জন্য এমন কি স্ত্রীকেও সে কথা জানান যায় না। বিশ্বাস-করল কি না জানি না। কয়েক দিন বেশ চুপ রইল। কিন্তু এসব কি কখনো

বেশিদিন সাপ্রেস করা যায়। এমনই পোড়া কপাল, পর পর দুদিন অনন্যার ফোন রজণীর হাতে ধরা পড়ে গেল। আমি তখন বাথরুমে। নির্দিষ্ট সময়েই বেজেছে। বাথরুম থেকে টের পাচ্ছি ফোনটা বাজছে। কিন্তু বেরোবার উপায় নেই। সারা গায়ে সাবান, তা-ছাড়া এক টুকরো সুতোও নেই গায়ে। একটানা বেজে যাওয়ার ফলে যা হয়, রজনী রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রিসিভারটা ধরেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে আহত অভিমানী প্রশ্ন : এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সেই কখন থেকে ফোন করছি।

রজনী আর অনু বয়সের সামান্য ব্যবধান সত্বেও বন্ধু। নির্মল ও আমার ঘনিষ্ঠতা ওদের নেই ঠিকই। তবে পরস্পর পরস্পরকে বেশ পছন্দ করে। যেমন অনু রজনীকে ছটি বিয়ার গ্লাস সেদিন উপহার দিল। রজনীও অনু এলে ভাত, ডিম ভাজা থালায় সাজিয়ে দিয়ে যত্ন করে বলে, ইস অনুর মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। খাও।

অনুও এই যত্নটুকু রেলিশ করে। বলে শ্বশুরবাড়িতে এত যত্ন কেউ করে না। সবাই চায় অনু তাদের জন্য দিনের বরাদ্দ চব্বিশ ঘণ্টা টুকরো টুকরো করে দিক। শ্বশুর চায় অফিসে যাওয়ার সময় ও ফেরার পর অনু তার জুতো জোড়া পরিয়ে দেবে ও খুলে দেবে। শাশুড়ির কোমরে বাত। তার ইচ্ছা তার পাটা অনু সারাদিন টিপে দিক। নির্মল চায় প্রতিদিন সকালে ব্রেকফাস্টে নতুন নতুন মেনু। ওদের চার বছরের ছেলে বিনয় ওরফে বিনুর কনস্ট্যান্ট কান্না, মা তাকে কোলে নিয়ে ঘুরুক। বাড়ির প্রায় আধ ডজন ঠাকুর-চাকরের দাবি, বৌদিমনি যেন নিজের হাতে তাদের ভাত বেড়ে দেয়। হাফ গেরস্থ টাইপের হাফ-সাহেবীদের যে ধরনের সব স্কুল আজকাল কলকাতায় গজিয়ে উঠেছে না, তাদেরই যেটায় অনু পড়ায় তার মালিক মহারাজটি রাতারাতি লাখোপতি হওয়ার ধান্ধায় ষ্টুডেণ্ট পিছু মোটা মাইনে হাতানোর জন্য বেছে বড়লোক ঘরের সুন্দর মেয়ে বৌদের টিচার করেছে। আসলে এই অনুরাই ওই ভদ্রলোকের মূলধন। অনুদের দেখিয়েই উনি উন্মাদ কলকাতায় ততোধিক উন্মাদ বাবা-মাদের টেনে আনছেন স্কুলে—মানিব্যাগ সমেত। সপ্তাহে তিরিশটা ক্লাস নিতে হয় অনুকে। সেই সঙ্গে সাড়ে তিনশ চার থেকে দশ বছুরী কাচ্চা-বাচ্চাদের অংক, ইংরাজি আর বাংলা খাতা দেখা ও কারেক্ট করা। এত করেও অনু মাইনে পায় মাত্র দুশ টাকা। বলবার মত নয়। মালিক মহারাজ কাউকেই কনফারম করেন না। তাতে নাকি পড়ানোর ইচ্ছে মরে যায়। স্কুলের ক্ষতি হয়। অনু মুখে বলে আমার কাজ করতে

ভাল লাগে। বাড়িতে বসে থাকতে পারি না। আসলে বোধহয় কাজটাকেই ভয় পায়। পাছে বাড়ির লোকজনের আবদার মেটাতে মেটাতে জান জেরবার হয়ে যায় তাই স্কুলটাকে বেছে নিয়েছে। বাড়িতে বেডরুমে দেয়াল আলমারিতে নির্মলের কলেজ লাইফে কেনা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ও ওর নিজের সাবজেক্ট বায়োলজির খান কয়েক বই-এর পাশে একখণ্ড জীবনানন্দ, দুটি ট্যুরিস্ট গাইড বুক আর একখানা পুরোনো রেকসিন বাঁধাই রিডারস ডাইজেস্ট। নির্মলের বন্ধু বান্ধবরা বাড়িতে এলে স্টিরিওতে রবিশঙ্কর চালিয়ে দিয়ে অনু ওই ডাইজেস্টখানা পড়ে। ঐ একখানাই ক্লাসিকাল রেকর্ড। বাকিগুলো সব হেমন্ত, বসন্ত, সন্ধ্যা, আরতি। সাইকোলজির ওপর কোন এক আমেরিকান বিজ্ঞানীর লেখা একটা গম্ভীর প্রবন্ধ রয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে দুবার উঁকি মেরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই একই পৃষ্ঠা—৩৩৩। অনু ফিলজফির এম এ।

বিপদ—রজনী সোজা ঘোষণা করল ও যাবে না। অনু, নির্মলের সঙ্গে তো নয়ই। তাছাড়া আমার সঙ্গেও নয়। এমনও বলল, পৈতৃক অবস্থা সঙ্গতিপূর্ণ হলে নাকি আমার মত পরনারীতে আসক্ত নোংরা লোকটাকে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে আমার একমাত্র কন্যা তিন্নির হাত ধরে বেরিয়ে যেত। এসব কথা এখন থাক। আজ সপ্তমী। ৮ অক্টোবর। কলকাতা থেকে পাঁচশ মাইল দূরে জলপাইগুড়ির এক কোণে গরুমারা রিজারভ ফরেস্টে বন্য প্রাণী দেখার ওয়াচ টাওয়ারে বসে লিখছি। এক ধরণের কেঠো পাখি আর ঝিঁ ঝিঁ সমানে ডেকে চলেছে। আমার পথ জুড়ে শুধু সবুজ শালের জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে হলুদ কানাইল ফুলে ছাওয়া ফুলন্ত গাছ। দূরে পাহাড়। সবুজ রং করা শাল কাঠের ওয়াচ টাওয়ারে দুটি লম্বা বেঞ্চ আর একটা বুক সমান উঁচু টেবিল। টুরিস্টরা এখানে বসে পূর্ণিমা রাতে জন্তু দেখে। প্রায় সাড়ে চারশো গজ বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। দক্ষিণবঙ্গ জলে ভেসে গেলেও উত্তরবঙ্গ অসম্ভব পরিচ্ছন্ন। নদীতে জল আছে—তবে চেহারাটা কলকাতার আদি গঙ্গার মত। নদীর পরেই কোমর সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল। মাঝে একটুকরো সাদা জমি খণ্ডের ওপর ছোট একটা ঢিপি। এসব ব্যাপার-সাপার আমি কিছু বুঝি না। নির্মল বলল, ওই ঢিপিটাই নাকি সল্ট লিক নুনের ঢিপি। গণ্ডাররা আসে নুন চাটতে। আর আসে হাতির পাল, মাঝে-মধ্যে বাইসনের দলও। কখনো-সখনো হরিণ ও সম্বর। বাঘ আছে বলে স্থানীয় কারোর কারোর ধারণা। নির্মল বলল সেরেফ ধাপ্পা। যা ছিল বনের কর্তারা ও পোচাররা মিলে সাফ

করে দিয়েছে। তবে নাকি দু-একটি চিতা ঘুরে বেড়ায়। কাঠের বাংলোর হাতায় ময়ূর ঘুরছে। নির্মল সব কিছু অরগানাইজ করছে। ও একটা পাকা গিন্নি। শিলিগুড়ির সিনক্লেয়ার হোটেল থেকে আজ সকালে রওনা দেওয়ার পথে ওলদাঝুরি বাজার থেকে আটটা মুরগী, বিশ কিলো চাল, চার কিলো আলু, আড়াই ডজন ডিম, দু বাক্স মোম, এক বাক্স সিগারেট, পাঁচটা দেশলাই পর্যন্ত কিনে এনেছে। এসেই বৌদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে রান্নার যোগাড়-যন্ত্রে নেমে পড়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন সব ঝামেলা, ঝগড়া সত্ত্বেও আমরা গরুমারাতে বেড়াতে আসতে পেরেছি। ওয়াচ টাওয়ারের গায়ে ইংরাজিতে একটি ফলকের গায়ে লেখা গরুমারা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিসন। এসটেড ২।৮।৪৯। এরিয়া ৮৬১-৫৮ হেক্টর (৮-৬০ স্কোয়ার কিলোমিটার)।

এবার বলি মশাই এই ১৯৭৮ সালের বানভাসি পশ্চিমবঙ্গে যখন গোটা দক্ষিণবঙ্গ শুধু উত্তরবঙ্গ থেকে নয়, গোটা দেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন তখন কেমন করে কিভাবে এখানে এসে পৌঁছোলাম। সে সব কথা বলব না দু চোখ ভরে জঙ্গলটা দেখ। বিশাল বিশাল কেয়াফুলের গাছ, যে কেয়াফুলে শিবের পুজো হয়, টাওয়ারের দুধারে অযত্নে বেড়ে উঠেছে। চারধারে বুনো ঝোপ। আমার মাথার ওপর যে মধ্যদিনের সূর্য ছটফট করছে, তা একবারও টের পাওয়ার উপায় নেই। মেঘ তো কখনো সবুজ হয় না, কিন্তু টাওয়ারের মাথার এই ছাতার মত লাম্বুনি গাছটাকে তাহলে কি বলব। ছোট সাইজের বট বা বড় সাইজের শিরিষের সঙ্গে অক্লেশে তুলনা করা চলে এই লাম্বুনি গাছের।

রজনী কিছুতেই আসতে চায় নি। প্লেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা সারা। আগের রাতে আমার ওপর রাগ করে তিন্নিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। আমি গোটা কয়েক কাম্পোজ এক গ্লাস রাম দিয়ে টেনে নিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম সোফাটায়। আর পারছিলাম না। একমাস ধরে সমানে বন্যা কভার করেছি। কোথায় বিহারের সিংভূমে সুবর্ণরেখার পাড়ে বহেড়াগোড়া আর কোথায় কলকাতার একবালপুর-মোমিনপুরের এক গলা জলে ডোবা বস্তি বা পূর্ব সিঁথির জলে ডোবা চালাঘরগুলির মানুষজন। করতে করতে একসময় টের পেলাম কলকাতাটার মত আমি মানুষটাও ভোঁতা আর তেতো হয়ে গিয়েছি। তাই নির্মল প্রস্তাব দিতেই লুফে নিলাম। বললাম চ।

বললাম তো। যাবো কি করে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রোড লিংক কাট অফ।

ইস্টার্ণ রেলের সি পি আর ও শান্তি বসু, আমাদের শান্তিদাকে গিয়ে বললাম একটা ব্যবস্থা করে দিন। অমায়িক, সদা অম্লান হাসি আর মাথার একঢাল চুল নিয়ে অতি ব্যস্ত মানুষটি বললেন, তিনটি ট্রেন চলত। এখন চলছে একটা। নো রিজার্ভেশন। টিকিট কেটে যেতে পারো তো যাও। বুঝলাম অসম্ভব। ওই একটা ট্রেন পৃথিবীর সব স্টেশনে থামবে। লক্ষ না হোক হাজার দশেক প্যাসেঞ্জার যারা কলকাতার বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিল, সবাই উঠবে —তাতে এই দুই বাঘিনী মার্কা বৌ আর তিন্নি ও বিনুর মত দুটো বিচ্ছুকে নিয়ে চলা দুঃসাধ্য। শান্তিদা কফি খাওয়ালেন। আমরা বেস্ট অব পূজা উইশ করে উঠে এলাম।

উঠে এলাম মানে নির্মলের ভাঙ্গা বজরার মত জিপখানাতে। বাইরের পৃথিবীর কেউ জানে না, আমি জানি আর আমার কাগজের কর্তারা জানেন, নির্মলের ওই জিপ্টা ছাড়া কলকাতার বন্যা কভার করা ছিল অসম্ভব। জিপের মাথার ওপর দিয়ে জল যাচ্ছে। নির্মল স্টার্টটা চালু রেখে জিপ থেকে নামতে নামতে শুধু একটু হেসে বলল, ঠেলবি।

কথা ছিল ডি সি পোর্ট ডিভিশনের অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনারকে একখানা পূজা বার্ষিকী উপহার দেব। রাস্তা থেকে সেটা কিনে নিয়ে দু বন্ধু চললাম একবালপুর থানায়। গিয়ে দেখি হ্যারিকেন আর মোমবাতির আলোয় একজন পুলিশ অফিসার আর কনস্টেবল। এসি ডি পি চ্যাটার্জি ছিলেন। পূজা বার্ষিকীটা পেয়ে খুব খুশী। আমি বললাম, একদিন মশাই লঞ্চে করে গঙ্গাটা আমাদের ঘোরান। নরম প্রকৃতির মানুষ একদা কলকাতার ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টের মার্ডার স্কোয়াডের ও-সি ছিলেন। কম করেও কয়েক শ মার্ডার কেস হ্যাণ্ডেল করেছেন। অতিরিক্ত মার্ডার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে বোধহয় মন নরম হয়ে যায়। বললেন, ডি সি পোর্ট মদনগোপালের সঙ্গে যদি একবার কথা বলে নেন।

জানতে চাইলাম : তিনি এখন কোথায়?

বললেন : আউট্রাম ঘাটের কাছের রিভার ট্রাফিকের অফিসে।

: ফোনে পাওয়া যাবে?

: হ্যাঁ ডাইরেক্ট লাইনটা চালু আছে।

: তাহলে একটু ধরুন না মিস্টার গোপালকে।

একবার দুবার নয়, ছ-ছবার চেষ্টা হল। কিছুতেই রিভার ট্রাফিক পাওয়া গেল না। ঠিক তখনই নির্মল বলে উঠল, হ্যাঁরে রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ

একটি পুরুষ। তার ওপর লেখক। কল্পনাপ্রবণ। এক মহিলার সঙ্গে বিশ বছর ধরে ঘর করতে করতে, বারে বারে সন্তান উৎপাদন করতে করতে, সারকাসের ক্রাউন তিনটে, ছটা, নটায় নানা খেলা দেখাতে দেখাতে যেমন সর্বদাই হাসে ঠিক সে রকম হাসতে হাসতে পেশাদারী দক্ষতায় বই লিখে টাকা রোজগার করে। উনচল্লিশটা উপন্যাস, ছটা ছোটগল্পের সংকলন, তিনটে রম্যরচনার বই বাজারে। চার বছর আগের সেই উপন্যাসটার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে এবার নাকি অ্যাকাডেমির জন্য নাম উঠেছে। বাড়ি হয়েছে, গাড়ি দুখানা। দুটি ছেলেই হিপি পোশাকে নিয়মিত কুংফু, আর কারাটে মার্কা ছবি দেখে। স্ত্রী রেবা সেজদার একখানা বইও পড়েনি। মাস গেলে অংক কষে হিসাব বুঝে নেয়—কোন্ কাগজ কত টাকা দেবে? কোন্ বই-এর কোন্ এডিশন চলছে? কোনটার হিন্দি হয়েছে বা কোন্‌টার তামিল এডিশন বেরিয়েছে?

রজনী, আমি জানি তুমি বই পড়ো। শুধু পড়ো না, পড়তে প্রচণ্ড ভালবাসো। লাইব্রেরি থেকে, পাড়ার বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পড়ো। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে সংসার খরচের টাকা বাঁচিয়ে অন্তত পঞ্চাশ টাকার বই কিনতে হয়। আর যখনই সেজদার কোন নতুন বই বেরোয়, সবার আগে উপহার পাও তুমি।

সেদিল ছিল বৃষ্টির রাত। আষাঢ় মাস অঝোরে ঝরছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি অফিস থেকে। যদি গাড়ি ঘোড়া এর পর বন্ধ হয়ে যায়, এই ভয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা সেজদারা আসবে। রজনীর নামে উৎসর্গ করা বইখানার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে রজনী বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে। সেজদা মদ পছন্দ করেন। তাই সকালেই দু বোতল হুইসকি আনিয়ে রেখেছি।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ওপরে উঠে আধ-ভেজানো সদর দরজাটা ঠেলে খুলতেই দেখি বসার ঘরের সোফার ওপর রজনী তোমার কোলে মাথা রেখে আমার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক দাদা শুয়ে আছেন। কিছু মনেও করতাম না, যদি না আমাকে দেখে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসতেন। রজনী তুমিও তোমার আঁচলখানা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লে। আমি যেন কিছুই দেখি নি এমন মুখ করে ঘরে ঢুকলাম। তারপর সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চলল খাওয়া-দাওয়া আর মদ্যপান। ঔপন্যাসিক দাদার স্ত্রী ও ছেলেরা কেউ সেদিন আসেনি। দাদা চলে যাওয়ার পর একটা

নোংরা কাজ করেছিলাম। সন্দেহে মরে যাচ্ছিলাম। তাই ফিস্ ফিস করে জানতে চেয়েছিলাম বৌদির কাছে—এলে না কেন? ফোনে জবাব এল—সে কি তোমার দাদা যে বলল শক্তি চাটুজ্জের বাড়িতে নেমন্তন্ন। সেখানে শুধু লেখকরাই আসবেন, কেউ কারো স্ত্রীকে আনছেন না।

অন্ধকারে চিনতে পারছি না জলপাইগুড়ি শহরটা। মাঝে মাঝে পুজোর আলোর মালা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে এটা একটা শহর হলেও হতে পারে। সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। জিপের হেড লাইটের আলোয় দেখলাম একটা কাঠের গেট। ওপারে মোরাম বিছানো খানিকটা রাস্তার শেষে বাংলো বাড়ি। তপন আমাদের গাড়িটা জিপের পেছনে রেখে বলল, স্যার এইটাই ডি এফ ও'র বাংলো।

শব্দকটা বোধহয় নির্মলের কানেও গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠল। গাড়ি থেকে নেমে দুজনেই এগিয়ে গেলাম জিপটার দিকে। মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঠিক সেই মুহূর্তেই জিপ থেকে নামতে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে আর নামলেন না। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি ভুরু জোড়া কুঁচকে রয়েছে। ভাবখানা : কি ব্যাপার?

পরিচয় দিয়ে বলালাম, আমাদের নামে গরুমারা ফরেস্ট ডাকবাংলোটা রিজার্ভ থাকার কথা। জাস্ট জনাতে এলাম তা আছে কি না?

ইনিই ডি এফ ও। একবারও জিপ থেকে নামলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন ও বাংলোটা দেওয়া যাবে না। তবে কুন্তিমারি বা চাপড়ামারি ডাকবাংলোটা পেতে পারেন।

তখন সি সি এফ-এর রিমাইণ্ডার লেটারখানা ওর হাতে দিয়ে বললাম আপনার ডিরেক্টর নিজে আমাদের বলেছেন গরুমারা ডাকবাংলো এক সপ্তাহের জন্য আমাদের নামে বুক করা থাকবে। তাই এত পয়সা খরচ করে এখানে এসেছি। কিন্তু এ আপনি কি বলছেন?

প্রায় আধঘণ্টা তর্কাতর্কির পর অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে ভদ্রলোক তারই সুপিরিয়র অফিসারের চিঠির উল্টো পিঠে তিনটি লাইন লিখলেন—এদের ৮ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত থাকতে দেওয়া যেতে পারে।

সবিনয়ে জানতে চাইলাম এই বাংলোটা কি অলরেডি বুকড?

: সে প্রশ্নের জবাব আপনাকে কেন দেব?—বলার ঢং অনেকটা ঠিক পুরোনো জমিদারের মত।

পেশায় সাংবাদিক। গায়ের চামড়াটা গণ্ডারের মত পুরু না হলে নাকি

খাঁটি সাংবাদিক হওয়া যায় না। তাই আবার জানতে চাইলাম : সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত থাকতেই যদি দিতে পারেন, তাহলে কেন অন্তত একটা গোটা দিন নয় ?

ততক্ষণে ভদ্রলোক জিপ থেকে নেমে এসেছেন। পা ঈষৎ টলছে। পেছনে ড্রাইভার। তার পেছনে আমরা। মোরামে জুতোর ঠোক্কর লেগে পাথর ছিটকে যাচ্ছে। বারান্দা পেরোতেই সামনে বসার ঘর। সোফা সেট। পেছনে একটা স্টাফ করা বারকিং ডিয়ার। ফায়ার প্লেসের উল্টো দিকের দেওয়ালে একটা বাইসনের মাথা। আগেই শুনেছিলাম এই ভদ্রলোক গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই ডিভিসনের দায়িত্বে এসেছেন। দেখলাম ন মাসেই জঙ্গল উজাড় করার প্রতিটি পদ্ধতি অক্লেশে রপ্ত করে ফেলেছেন। তাছাড়া কলকাতায় অমলদার মুখেই শুনে এসেছি ভদ্রলোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাই স্টেট গভর্নমেন্টের বড় কর্তাকে পাত্তা দিতে আর প্রস্তুত নন।

এর সঙ্গে আর কথা বলা মানে নিজেদের অসম্মান করা। তাই নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি আবার ছুটছে শিলিগুড়ির পথে। এমন সময় মাথায় লাল আলো জ্বালানো একটা অ্যামবাসাডার দেখে নির্মল বলল, মনে হচ্ছে ডি সি বা সি পির গাড়ি। হাত দেখিয়ে থামালাম। ডি সি ই ছিলেন গাড়িতে। অত্যন্ত ভদ্রলোক। গিয়েছিলেন ডাইহিলে সদ্যপাস করা ফরেস্টারদের কনভোকেশনে। ওরই মুখে শুনলাম সুবলবাবুও এসেছেন ডাইহিলে। উঠেছেন শুকনা রিজার্ভ ফরেস্টের ডাকবাংলোয়। আমাদের হোটেল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার। হাতঘড়িতে বাজে তখন দশটা।

হাতঘড়ির কথাটা যখন ফের উঠল তখন ঘড়ির প্রসঙ্গটা সেরে নেওয়া দরকার। কিছুদিন আগে আমার হাতঘড়িটা হারিয়ে গিয়েছিল—একথা তুমি জানো রজনী। এর আগেও বারকয়েক হারিয়েছে। আগে মনে হত ঘড়ি বড় এসেনসিয়াল। সময়মত হাজিরা দেওয়া, লোকের সঙ্গে অ্যাপোয়েন্টমেন্ট রাখা ইত্যাদির জন্য দরকার। এবারই মনে হল ঘড়ি গেল তো আপদ চুকল। কারণ সময় এখন আমার কাছে থেমে আছে। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে এই ওয়াচ টাওয়ারের অপর পাড়ে এনডং আর মূর্তি নদী দুটির মাঝখানে শাল, শিমূল আর শিরিষের গাছ নিশ্চল হয়ে রয়েছে। কি হবে সময় দিয়ে ? যে সময় কোথাও কাউকে পৌঁছে দেয় না। আমি তো জানি রজনী, তুমি আমি অনু আর নির্মল এক একটা গাছের মত দূরে দূরে ছড়ানো। সম্পর্ক শুধু

মাটির। সেই মাটিও এক সময় আমাদের ওই গাছগুলোর মতই জীর্ণ করে ধ্বংস করে ফেলবে—আজ যেমন পুষ্ট করছে।

অনু বলেছিল, ওর হাতঘড়িটা আমায় দেবে। হেসে বলেছিলাম—প্রয়োজন নেই। যদি থাকত তাহলে কিনে নিতাম। তাছাড়া তুমি হঠাৎ তোমার হাত নিঃস্ব করে ঘড়িটা আমায় দিলে কথা উঠতে পারে। সে কথা কারো পক্ষেই হয়তো বাঞ্ছনীয় হবে না।

ব্যাপারটা এখানেই মিটে গিয়েছিল। এবার রওনা দেওয়ার সময় নির্মল যখন ট্যাক্সিটা নিয়ে আমার বাড়িতে এল তখন দেখি নির্মলের হাতে অনুর সেই ঘড়ি। বলল : বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিস অনুর রিকোয়েস্ট ঘড়িটা পর।

: অনু কোথায় ?

: বিনুকে খাওয়াচ্ছে। সব রেডি। তোরা গাড়িতে ওঠ। পথ থেকে ওদের তুলে নেব।

ঘড়িটা নিলাম। তোমার সামনেই কব্জিতে বাঁধলাম রজনী। সেই মুহূর্তে তোমার মুখ চোখ পড়তে পারছিলাম। গাড়িটা যখন বড় রাস্তার মোড়ে এল, এবার বাঁক নিয়ে নির্মলদের বাড়ির দিকে যাব তখন ড্রাইভারকে বললাম গাড়িটা একটু থামাও।

নির্মল অবাক হয়ে বলল : কেন ?

: দরকার আছে। তুইও আয়।

নির্মল সঙ্গে এল। রাস্তার ওপরেই ঘড়ির দোকান। দোকানদারকে বললাম একটা লেডিজ রিস্টওয়াজ দিন তো।

নির্মল বিস্মিত হয়ে বলল কি করবি রে ?

: দাঁড়া না।

দোকানদার ঘড়ি দিল। আমি দামটা চুকিয়ে দিয়ে বললাম, এই ঘড়িটা তুই নিজের হাতে রজনীকে পরিয়ে দিবি। নইলে অনুর এই ঘড়ি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রজনী তুমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে যখন নির্মল তোমাকে ঘড়িটা প্রেজেন্ট করল। তুমি আজো জানো ঘড়িটা নির্মলই তোমাকে দিয়েছে। অনুও তাই জানে। শোধবোধ। দুই বন্ধু সস্ত্রীক বেড়াতে যখন বেরোচ্ছি তখন আর কোথাও কোন ফাঁক রাখব না।

সিনক্লেয়ার হোটেলের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়িটা তীরের মত ছুটে চলল। শুকনা ফরেস্ট ডাকবাংলোয় যখন পৌছুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। সুবলবাবু শুনলাম একটু আগেই খেয়ে শুতে গিয়েছেন। কাঠের বাংলো বাড়ি।

চারদিকে বারান্দা রেলিং। দোতলায় আছেন উনি। নির্মল একতলায় একটা বেতের সোফায় হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আমি এক বনবিভাগের লোককে ধরে বললাম: কোন ভয় নেই। ওকে গিয়ে আমার নাম বলুন। উনি আমাকে চেনেন।

বড় সাহেবকে ভয় পাওয়াটাই এই দেশের রেওয়াজ। অনেক সাধ্যসাধনার পর লোকটি ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সুবলবাবুর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। তখনো উনি ঘুমোন নি। উঠে এলেন। এত রাতে! আমাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন: কি ব্যাপার? আপনি গরুমারা যান নি?

: না। কেন যেতে পারি নি, তার কারণ আপনার নিজের সই করা এই চিঠি আর উল্টো পিঠে আপনারই সাব-অরডিনেট ডি এফ ও'র নোট।

উল্টে পাল্টে চিঠিটা বার বার পড়ে ভদ্রলোক একটু গুম হয়ে রইলেন। আবার লজ্জা হচ্ছিল এত রাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে একজন প্রবীণ ক্লান্ত মানুষকে বিছানা থেকে তুলে এনে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে। তবে উনি বেশি সময় নিলেন না। ডি. এফ. ও'র নোটের তলায় ইংরেজিতে খস খস করে লিখে দিলেন। নোটটা পড়েছি, সব দিক বিবেচনা করে নির্দেশ দিচ্ছি যদি অপর কোন ভিজিটারের নামে আগে থেকে এই ডাকবাংলো বুক করা না থাকে তাহলে যেন গরুমারা ডাকবাংলো এদের নামে বুক করা হয়।

জানো রজনী এত হুজ্জুতি এত ছোটাছুটি সেই রাতে কেন করেছিলাম? মনে মনে বলি। খুলে বললে এই কেয়াফুলের গন্ধও তোমার কাছে বাসি হয়ে যাবে। আসলে এ যুগে বীরত্ব দেখানোর, নারীর মন জয়ের অন্য কোন পথ তো আর খোলা নেই। তাই যদি কাল সকালে সত্যি সত্যি গরুমারায় আমরা ঢুকতে না পারি তাহলে অনুর চোখে বড় ছোট হয়ে যাব। মনে করবে মুখে যত বড়াই করি আসলে একটা ঢোঁড়া সাপ।

যাক গে এসব কথা। ভোর হল। সপ্তমীর সকাল। আটটা নাগাদ হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে মালপত্র সব গাড়িতে ওঠানো হল। নির্মল সব তদারকি করছে। তপন গাড়ির ইঞ্জিনটা একবার চেক করে নিচ্ছে। রজনী তুমি তখন বিনু আর তিন্নিকে নিয়ে লাউঞ্জে বসে রয়েছ। অনু হোটেলের সিঁড়িতে একা একা দাঁড়িয়ে। গাড়িতে ওঠার ছল করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গলা যতদূর সম্ভব নামিয়ে বললাল: কাল থেকে একটি কথাও বলনি। এত রাগ করছ কেন?

: তুমিও তো বলনি।

আমি ভেবেছিলাম ব্যস্ত লাউঞ্জে লোকজনের হাঁটাচলার শব্দে বুঝি সব ঢাকা পড়ে যাবে। ভুল। তাই সপ্তমীর এই অসামান্য সুন্দর রাতে তুমি যখন আমাকে বললে, অনু রাগ করলে, তোমার সঙ্গে কথা না বললে, তোমার খুব কষ্ট হয় না? তোমার গলায় ঝাঁঝ, ব্যঙ্গ, বিরক্তি তারপরই জানতে চাইলে: অনু আমার চেয়ে কিসে শ্রেষ্ঠ, কেন তুমি অনুকে ভালোবাসো?

রাত বাড়ছে। গাছপালাও অন্ধকার রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। কথা ছিল সন্ধ্যার একটু আগে যখন নদীর পারে, লবণ ঢিবির গায়ে বন্য জন্তুর দল জল খেতে, জিবের স্বাদ বদলাতে, বুনো হাতি পুরুণ্ডি ঘাস খেয়ে তৃপ্ত হতে আসবে তখন নির্মল আর আমি দুজনে বেরোবো। বেতলাতে সুন্দরবনে দুই বন্ধু ঠিক এই-ভাবেই দিনের পর দিন ঘুরেছি। বেতলায় গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে, সুন্দরবনে লঞ্চ বা নৌকোয়। কখনো কখনো জোয়ারের জল নেমে গেলে হাঁটু অবধি কাদায় নেমে হরিণ, বাঘ দেখার চেষ্টা করেছি। কখনো দেখেছি কখনো দেখার সুযোগই ঘটেনি। ওয়াচ টাওয়ারে বসে সকাল থেকে লিখছিলাম। তিনটে নাগাদ যাওয়ার জন্য বাংলোতে ফিরে গিয়ে শুনলাম নির্মল ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ ক্লান্ত।

হবেই তো। সকালে রওনা দিয়ে আমরা দশটা নাগাদ এসে পৌছালাম ওলদামারি বাজারে। আজ হাটবার চারিদিকে দোকানপাট খোলা। রাস্তার ধারে একটা একতলা পুরোনো সিনেমা হল। গঙ্গা কি সৌগন্ধ নামে একটা হিন্দি ছবি চলছে। বাজার মানে টিপিক্যাল মফঃস্বলের অখ্যাত শহরের হাট যেমন হয় ঠিক তাই। গোটা আট দশেক মনোহারি দোকান। রাস্তার ধারে ঢেলে চাল বিক্রি হচ্ছে। গোটা দুই মুদির দোকান। কয়েকজন আপেল ও কলার ব্যবসায়ী। চুবড়ি নিয়ে বসে আছে মুরগী বিক্রেতা। একটা ছোট মোটর সারানোর কারখানা। এই রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে চা-বাগানের মালিক, মিলিটারি আর টুরিস্টরা ছোটাছুটি করে—তাদের প্রয়োজনের জন্য যা যা লাগে আর কি।

গরুমারাতে কেন খাবার পাওয়া যাবে না। নির্মল এসব ব্যাপারে সত্যি ওয়াকিবহাল। ও গেল মুরগী, চাল আর টর্চ লাইট কিনতে। আমি কিন্তু আপেল কলা সিগারেট দেশলাই ও মোমবাতি কিনলাম। গাড়ির কারবুলেটর খারাপ হয়ে গিয়েছে। তখন স্থানীয় মেকানিককে দিয়ে ঝটপট সারিয়ে নিচ্ছে। অনু গিয়েছে চাল কিনতে। রজনী বাচ্চা দুটোকে সামলাচ্ছে। রাস্তার ধারে একটা শিরিষ গাছের নীচে দেখি বেশ কয়েকটা শাল কাঠের সাধারণ চেয়ার

সাজানো। দোকানীর নাম অনিল মণ্ডল। দেশ ছিল ফরিদপুরে। দেশ বিভাগের পর এসে উঠেছিল নদীয়ার বেতাইয়ে। তারপর কাজ খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এই ওলদামারি বাজারের কাছে মলানীতে এসে উঠেছে। জঙ্গল থেকে দশ টাকা মণ শালকাঠ কেনে। সারা সপ্তাহ ধরে চেয়ার বানায়। তারপর বাসের মাথায় ওই চেয়ার চাপিয়ে চলে আসে হাটে। বারো চোদ্দটা চেয়ার। এক একটার দাম সাত আট টাকা। সব দিয়ে থুয়ে হপ্তা শেষে ষাট-সত্তরটা টাকা নিয়ে ঘরে ফেরে। ওই টাকায় বৌ, তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ের সংসার চালায় অনিল। বয়স বলল পঁয়ত্রিশ। ওর সাদা মাথাটা দেখে মনে হল পঞ্চান্নও হতে পারে ষাটও হতে পারে। জীবন ও জীবিকা যৌবনকে বুলডোজারের মত গুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। অনিল আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে বলল : কোথায় যাবেন ?

: গরুমারা।

: এতদিন এই জঙ্গলের কাছেই তবু কোনদিনও যাওয়া হল না। বৌটার বড় সখ ছিল।

: তা একবার নিয়ে যাও না অনিল।

: ও যে ভীষণ খরচের ব্যাপার বাবু : এই দেখুন না গত হপ্তায় জঙ্গল-বাবুদের পেনামী দিতে পারলাম না, তাই দু মণ কাঠ ওরা দিল না।

: পেনামীটা কি ?

: ওই যে জঙ্গলের চোরাই কাঠ বাবুরা বেচেন তার জন্য মণ পিছু দু টাকা এক্সট্রা।

: সপ্তাহে তোমার ক মণ কাঠ লাগে অনিল ?

: চার মণ হলে বারো থেকে চৌদ্দটা চেয়ার বানাতে পারি।

: এবার কটা এনেছ ?

: মাত্র সাতখানা।

: সব যদি বিক্রি হয় তাহলে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ঘরে কটা টাকা নিয়ে যেতে পারবে ?

আধ খাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, বড় জোর কুড়িটা টাকা। বলুন তো কুড়িটা টাকায় ছটা প্রাণীর সাত দিনের খোরাকী হয় ? অনিলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই রাস্তার ওপার থেকে নির্মল আমাকে ডেকে বলল : একশটা টাকা দে তো। আটটা মুরগী নিচ্ছি। কলকাতার অর্ধেক দাম।

একটু বাদেই আমরা আবার রওনা দিলাম। মাইল পাঁচেক এগোতেই

দেখি রাস্তার ডান ধারে কাঠের সাইন বোর্ড : গরুমারা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস। উল্টো দিকে একটা ট্রাক দাড়িয়ে। কয়েকজন মজুর একটা শাল কাঠ ধরাধরি করে ট্রাকে তুলছে। প্যান্টের ওপর হাওয়াই শার্ট জড়ানো মোটাসোটা কালো মত এক ভদ্রলোক তদারকি করছেন। পরিচয় পেলাম উনিও একজন রেঞ্জার। আগে এই বনে ছিলেন। রিসেণ্টলি বদলি হয়ে গিয়েছেন। সি সি এফ-এর চিঠিটা দেখে নিজে আমাদের নিয়ে রেঞ্জ অফিসে গেলেন। রেঞ্জার বাবুকে দিয়ে গরুমারার একটা পাশও লিখিয়ে দিলেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে পৌছে দিয়ে গেলেন এই ডাকবাংলোয়। এখন মধ্য দিনের সূর্য মাথার ওপর। ছায়ারা সব ছোট হতে হতে পায়ের পাতার সঙ্গে লেপ্টে গিয়েছে।

চৌকিদার নেই। ছুটিতে। শেষ পর্যন্ত ওই রেঞ্জারবাবুর অনুরোধে মালি রাম তার চাকরিগত প্রেসটিজ বিসর্জন দিয়ে রাজি হল এ বেলার মত দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিতে। সবাই ক্লান্ত। আমার চোখে ঘুম নেই। এত চেষ্টা করি একটু ক্লান্ত হওয়ার—তাও পারি না। লিখতে বসলাম।

একটা অধ্যায় শেষ করে নিজেই একা বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গলটা দেখতে। কাঠের দোতলা বাংলো বাড়ি। দোতলায় দুটি বেডরুম, উইথ অ্যাটাচড বাথ। পাশে আর একটা ছোট বেডরুম। চট করে চোখে পড়ে না। কাঠের সিঁড়ি। কাঠের বারান্দায় পাটের কারপেট। দূরে এনডং নদীর ধারে একটা ইঁদারা। জেনারেটর চালিয়ে ওই ইঁদারা থেকে খাওয়ার জল তোলা হয় একটা ট্যাংকে। সেই ট্যাংক থেকে চালান হয় বাথরুমে বেসিনে। নীচের বড় হল ঘরটা ডাইনিং রুম। গরুমারা ফরেস্টের ম্যাপ ঢুকতেই চোখে পড়ে। গরুমারা হল জলপাইগুড়ি ফরেস্ট ডিভিসনের আণ্ডারে লাটাগুড়ি রেঞ্জে। পাঁচটা বিট নিয়ে একটা রেঞ্জ। বিটগুলো হল রামসাই, কালামাটি, বড়দিহি, সেণ্ট্রাল ও গরুমারা। দেয়ালে বিভিন্ন ফরেস্টার বা রেঞ্জারের আঁকা বাইসন হরিণ বা সাহেবের ছবি। গোটা কয়েক ফটোগ্রাফ। দোতলার বারান্দায় কাঠের স্তম্ভের গায়ে বাইসনের মাথার খুলি। বাংলোটাকে সুরক্ষিত করার জন্য একদিকে যেমন নদী, অন্যদিকে খাল। পাছে হাতি বা গণ্ডার এসে উৎপাত করে, খালের ওপর একটা ছোট কাঠের সাঁকো। প্রয়োজনমত ওঠানো যায়। ওই সাঁকো পেরিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম। একটা গাড়ি চলবার মত সরু পথ। দু-ধারে ঘন শালের জঙ্গল। মাটিতে মাইকেনিয়া লতা ক্রমাগত পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। শালগাছগুলির গুঁড়িতে সাদা দাগ কাটা। রিসারচ চলছে। দু বছরে কোন্ গাছের গ্রোথ কতটা হচ্ছে তার পরীক্ষা। ঝিঁঝির

ডাক ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। দিনের আলো ক্রমশ কমে আসছে। চোখে চশমা। এবার দেখতে কষ্ট হচ্ছে। তবু হাঁটতে ভাল লাগছে। কত রকম যে বুনো ফুলের নতুন নতুন গন্ধ। ঘাসের গন্ধ এখানে আলাদা। কলকাতার ময়দানে যারা প্রতিদিন স্বাস্থ্যোদ্ধারে যান, তাঁরা জানেন না, শহুরে ঘাসের সঙ্গে জঙ্গলের ঘাসের মিলের চেয়ে অমিল বেশি। এই ঘাস হাঁটু অবধি আলতোভাবে নয়, গভীরভাবে ডুবিয়ে দেয়। কত নতুন লতা দেখছি। ইস যদি বোটানিস্ট হতাম তাহলে এইসব লতার নাম আমি জানতাম, চিনতে পারতাম। ওই সব বুনো ফুলের রং-এর উৎস আমি অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারতাম। রজনী তুমি জানো না হাঁটতে হাঁটতে ঘাসে, মাইকেনিয়া লতায় যত পা জড়িয়ে যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে কে যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে—নিবিড়-ভাবে। দেখতে পাইনি সামনেই একটা ছোট পাথর পড়েছিল। দড়াম করে আছাড় খেলাম। উঠতে গিয়ে দেখলাম নাকে-মুখে বুনো লতার ছোট ছোট পাতা উঠে এসেছে। কি লতা—নাম জানি না। কেন যে কেউ এই পাতা বেঁটে মেয়েদের ঠোঁটে-মুখে মাখিয়ে দেয় না। এর চেয়েও কি ইমপোরটেড সেণ্ট আরো সুগন্ধি? এসব কাজ যাদের করার তারা একদিন নিশ্চয়ই করবেন। তবে রজনী একটা কথা বলি, জঙ্গলে এসেছি কেন জান—জঙ্গল দেখতে নয়। জঙ্গলে এসে তুমি, আমি, নির্মল, অনু কতটা প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে পারি, শুধু সেইটুকু জানার জন্য। শ্রেষ্ঠতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শাল আর শিমুলকে বাদ দিলে এই জঙ্গলের আর থাকে কি? রজনী তুমি আর অনু যদি কোন কারণে বিষন্ন হয়ে যাও, ভুল বোঝ, তাহলে আমাদেরই বা থাকে কি। জঙ্গলে এসেছি শুধু নিজেদের চিনতে। মাইকেনিয়া লতাকে শুনলাম জঙ্গলে বাবুরা ভয় পান। সব গাছ মেরে ফেলেছে। গোটা বনটাকে ছেয়ে ফেলছে। রজনী তুমি আর অনু পারো না ওই লতার মত আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে, গ্রাস করতে। একদিন—সেইদিন, জানবে জীবনে আমরা কেউ কারো চেয়ে বড় নই। আসল লড়াইটা অধিকারের। মাইকেনিয়া চায় জঙ্গলটাকে গ্রাস করতে। শাল, শিমুলও চায় টিকে থাকতে। টেকাটাই বোধহয় শেষ কথা। রাত এখন কত জানি না। প্রেম, ভালোবাসার শিকড় ওই অধিকারবোধের মাটিতেই গাঁথা। জানি না, তুমি আদৌ আমাকে বিশ্বাস কর কি কর না। দেখি হাতে তো আরো কয়েকটা দিন আছে—জঙ্গলে আমরা কে কেমন হয়ে যাই সেটুকুই দেখি না। জঙ্গল তো থাকবেই—আমরা নাও থাকতে পারি।

গরুমারা দিনপঞ্জী

৯ অক্টোবর : অষ্টমী

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল মালি রামের ডাকে। খবর দিল বিটবাবু এসেছেন। এই সাত সকালে বিটবাবু আবার কেন? নীচে নেমে এলাম চোখ মুছতে মুছতে লুঙ্গির কষি বাঁধতে বাঁধতে। পাতলা একহারা একটা মানুষ। প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট। নাম যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গরুমারা ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসের যে চিঠিটার জোরে এই বাংলোয় প্রবেশাধিকার পেয়েছি সেটি দেখতে চান। আরো দেখতে চান সি সি এফ-এর লেখা সেই চিঠিটা। ঘুমভাঙ্গা চোখ জোড়ায় মনে হল রক্ত ফেটে পড়বে এখুনি। গতকালই যে ছাড়পত্র দেখিয়েছি, সেই ছাড়পত্রই আবার দেখাতে হবে। তবে ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র। নিরুপায় মানুষ। নিশ্চয় সাহেবের হুকুমে কর্তব্য পালনে এসেছেন। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। চা খান। চিঠিদুটো আমার বন্ধুর কাছে আছে। ঘুমোচ্ছে। এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।

তখন ভদ্রলোক হাওয়াই শার্টের বুক পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে দিলেন। ইংরাজিতে লেখা। কোন লেটার হেড নয়। চিঠির নীচে যার স্বাক্ষর, শিবের বাবার অসাধ্যি তার নাম পড়তে পারে। কোন শীলমোহর পর্যন্ত নেই। হাতের লেখা জায়গায় জায়গায় প্রায় ব্রাহ্মী হরফে পৌঁছে গিয়েছে। তবু কষ্ট করে পড়তে লাগলাম। মোটামুটি পড়ে মানে যা বুঝলাম তা হল, বাংলো অধিকারীদের বলে ১১ তারিখ অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিন সকালেই যেন বাংলো ভ্যাকেটে করে দেয়।

চিঠিটা পড়ে যতীনবাবুর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম, এর পরও কি আর আপনার পুরনো ওই পাশপোর্ট দুটো দেখার কোন প্রয়োজন আছে? এই চিঠিটাই তো স্বীকার করে নিচ্ছে যে দশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের থাকার অধিকার আছে।

ভদ্রলোক কাতরমুখে বললেন, আমি সামান্য বিট অফিসার। বড় বড় অফিসারদের মধ্যে কি লড়াই. কিসের লড়াই কিছুই জানি না। তবে পড়ে তো দেখলেন এক চিঠিতে ওই দুটো পাশপোর্ট আমাকে আবার চেক করে দেখতে বলা হয়েছে।

রামকে দিয়ে ওপরে ফের পাঠালাম। নির্মল পাজামার ওপর বুশশার্ট চাপাতে চাপাতে নীচে নেমে এল। ওই শার্টের পকেটেই রয়েছে চিঠি

ছুটো। রাম চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোক চা খেলেন। পাশপোর্ট ছুখানায় চোখ বুলিয়ে বললেন, সবই তো ঠিক আছে। আপনাদের এক সপ্তাহের বুকিং। তবে যে কেন এই চিঠি, কিছুই বুঝতে পারছি না। যাকগে আমায় মাফ করুন। আজ তাহলে আসি। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে রামকে বলবেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব।

নির্মল পাশপোর্ট ছুখানা পকেটে পুরে ওপরে উঠে গেল। যাওয়ার আগে রামকে বলল : মাহুতকে খবর দিয়েছ ? হাতি আসছে ?

রাম বলল : আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। নির্মল ওপরে চলে গেল। বিটবাবুকে বললাম একটু দাঁড়ান কথা আছে। আপনাদের অফিসাররা তো দূরে কোন সদর শহরে বসে ফাইল পড়ে জঙ্গল চেনেন আর মঝে-মধ্যে ফরেষ্ট বাংলোয় এসে সরকারী এ্যাকাউণ্টে আনন্দ করে যান।

মনে হল আমার কথাগুলো বিটবাবুর ভাল লাগেনি। ঘুরে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের ঠোঁটছুটো পাতলা—বড়জোর বছর ত্রিশেক পুরনো। কথা বলার সময় নাকের পাটা কাঁপে। বললেন, এসব কি বলছেন ?

: কথাগুলো বলার আগে গতকাল এখানে পৌছেই আমি কতগুলি হিসেব নিয়েছি যতীনবাবু। যদি রাগ না করেন তো স্টাটিসটিকগুলো এক রাউণ্ড আউড়ে দিচ্ছি। ভুল হলে শুধরে দেবেন। পাঁচ বছরের রেজিষ্ট্রিখাতা ঘেঁটে দেখলাম সরকারী ট্যাকসের টাকায় বানানো এই স্যাংচুয়ারিতে পাঁচ পারসেণ্টও বেসরকারী লোক থাকার সুযোগ পায়নি। ১৯৪৯ সাল থেকে আজ এই ১৯৭৮ সালের উনত্রিশটা বছরে কম করেও এই স্যাংচুয়ারির জন্য উনত্রিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকাটা দিয়েছে আমার মত সাধারণ মানুষ। অথচ রেজেষ্ট্রি খাতার পাতার পর পাতায় দেখি ভিজিটরের ঘরে লেখা ডিভিশনাল কমিশনার, ডি-এফ-ও, এস-পি, এস ডি ও, এস ডি পি ও, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি অসংখ্য পদস্থ অফিসার। কত সামান্য খরচ এই বাংলোয় থাকার। খাবার জলের জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু দেড় টাকা। জ্বালানী কাঠের জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা। বিছানা ভাড়া মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা। আর যতদিন খুশী থাকুন, যাওয়ার আগে ঝাড়ুদারকে একটি টাকা দিলেই চলবে।

যতীনবাবু বিরক্ত। চাপতেও রাজি হলেন না বিরক্তি।—এসব কথা কেন আমাকে শোনাচ্ছেন ?

: একটি মাত্র কারণে। যে ফাইভ পারসেণ্ট বেসরকারী মানুষ এই বাংলোয় থাকার সুযোগ পেয়েছে তাদের নামের পাশে দেখুন সবাই যে কদিন থেকেছেন, সে কদিনের প্রতিটি আইটেমের চার্জ লিখে দিয়ে গিয়েছেন। যাদের আবার এই জঙ্গলকে ভাল লেগেছে তারা কেউ কেউ মন্তব্য কলমে ভাল লাগার কথা লিখেও গিয়েছেন।

বলতে বলতে মনে পড়ে গেল রেজিস্ট্রি খাতার পাতায় লেখা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক দম্পতির কথা। অসিত ভট্টাচার্য ও শস্তা ভট্টাচার্য। আটষট্টি সালের আঠারোই মে বিকেল পাঁচটায় ওঁরা ঢোকার অধিকার পেয়েছিলেন। ফিরে যান পরের দিন সকাল ৮টায়। যাওয়ার আগে লিখে গিয়েছেন—'এত সবুজ স্বাভাবিক শুদ্ধতা জীবনে বেশী দেখিনি। আমার তৃষ্ণা রইল এখানে আবার আসার। অনেক সময় ধরে এই শ্যামলতায় অবগাহন করে নিজেকে অতিক্রম করে অরণ্যকে অনুভব করার। জানি না সে সুযোগ আর পাব কিনা।

ওপরের লাইনগুলো যতই কাব্যিক আর ন্যাকামি ন্যাকামি লাগুক, শেষের কথা কটি বড় সত্যি, বড় নিষ্ঠুর। সুযোগ সত্যিই বোধহয় ওরা আর পাবেন না।

বিটবাবু বলে গেলেন। মাহুত এসেছে হাতি নিয়ে। নির্মল রেগে কাঁই। ভোর পাঁচটায় আসার কথা ছিল। কেন এত দেরী করল। এখন বেলা হয়ে গিয়েছে। জঙ্গলের জন্তুরা এতক্ষণে আবার জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। এখন আর কিচ্ছু দেখা যাবে না। মাহুত কাঞ্চা ভোনিল কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। অনু এখনো ওঠে নি। বিনু ঘুমুচ্ছে। বিটবাবুর সঙ্গে এনকাউণ্টারের পর থেকে মুখটা তেতো। তাছাড়া পুরোন অভ্যেস। কাগজের লোক বাড়ি ফিরি রাত করে। পরের দিনের জন্যে দেহটা তৈরি করতে চার-পাঁচ কাপ চা, প্যাকেট খানেক সিগারেট আর প্রচুর ঠাণ্ডা জলে স্নান প্রয়োজন। এসব সারতে সারতে আরও ঘণ্টা দুই লাগবে। রজনী একাই উৎসাহী। কেউ না যায় তো একাই যাবে। কাঞ্চা ভোনিলও যেন একটা খদ্দের পেয়ে বর্তে গেল। পরম উৎসাহে হাঁটু গেড়ে বসা হাতির পিঠে মই লাগিয়ে রজনীকে তুলে নিল হাওদায়। আসতে আসতে বনের রাজা হেলতে-দুলতে এগোতে লাগল।

পাশের ঘরে শুনতে পাচ্ছি নির্মল আর অনুর ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা—অস্পষ্টও ঠিক নয় ভাসা-ভাসা। ওরা স্বামী-স্ত্রী। এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ

আমি কেন জেলাসিতে ভুগছি। বারান্দায় বসে দেখতে পাচ্ছি দূরে এনডং বয়ে চলেছে। শাল জঙ্গলে পাখি-পাখালির ডাক। বাংলোর হাতার ছাটা লনে জনা কয়েক ফরেস্ট ওয়াচার ঘাস সাফ করছে। রজনী একা চলে গেল। জানি খুব দুঃখিত। চেয়েছিল আমি অন্তত ওর সঙ্গে যাই। যাওয়াটাই তো উচিত ছিল। তবু গেলাম না। আসলে ইচ্ছেই করল না। কিন্তু অনু যদি বলত? তাহলে? অথচ রাতে লাম্বুনি গাছের নীচে ওয়াচ টাওয়ারে রেলিংয়ে ভর দিয়ে রজনীকে কত কথাই না বলেছি। ঠিকই বলে রজনী। তুমি আর সেই তুমি নও। বদলে গিয়েছে। আমাকে তো নাই-ই, এমন কি তিন্নিকেও আর আগের মতো ভালবাসো না। হাওদায় ওঠার আগে ছলছল চোখে বলেছে, যদি ভালই না বাসলে তবে কেন নিয়ে এলে। আসলে এই বেড়ানোটা একটা কামফ্লেজ। তুমি অনুর সঙ্গে মিশতে চাও, কথা বলতে চাও, ওকে ভালবাস—সামাজিক লাজ-লজ্জা এড়ানোর জন্য দুটি পরিবারের এই সফর।

দূরের ধূসর পাহাড় সারির ওপারে অস্পষ্ট আকাশে চোখ বুলোতে বুলোতে টের পেলাম রজনীর প্রতিটি কথা সত্য। আমার সবটাই কামুফ্লেজই। জঙ্গল বলে সব ঢেকে রাখে—তাহলে এই জঙ্গলে আমার আসল চেহারাটা এত ভালভাবে চিনতে পারল কি করে রজনী।

আকাশটা ছেঁড়া ছেঁড়া কাল মেঘে ঢাকা। মেঘের ওই ছায়া সামনের মাঠে ঘাটে নদীতে আসতে আসতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় বিষণ্ণ লাগছে। বিপন্নও। কত দিন আর এভাবে চলতে পাবে। নির্মল, অনু শুয়ে থাক। আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম।

পরিখা পেরিয়ে গাড়ি চলার বা পায়ে হাঁটার রাস্তাটা ধরে সোজা হেঁটে চললাম এই বিটের সদর দরজা চেকনাকার দিকে। রাস্তাটা যেখানে একটা লম্বা শাল কাঠ দিয়ে আটকানো। এন, ভি, এফ, কর্মীরা ওই চেকনাকার মুখটা পাহারা দিচ্ছে। বাংলো থেকে রাস্তাটা প্রায় ছয় কিলোমিটার। এই বাংলোর নিরাপত্তা ওই ছয় কিলোমিটার দূরের এন ভি ক্যাম্পের দশটি ন্যাশনাল ভলানটিয়ারের। ঢাল তরোয়ালহীন এই এন ভি এফদের চেহারার দিকে পর্যন্ত তাকাতে কষ্ট হয়। দু বেলা খাদ্য পর্যন্ত জোটে না। অথচ সকাল বিকেল ভি, আই, পি গাড়ির কর্তাদের স্যালুট ঠুকতে-ঠুকতে ক্লান্ত। যদি জঙ্গলের আসল ভি, আই, পি রয়াল বেঙ্গল মহারাজ কখনও এসে ওই চেকনার সামনে হাই তুলে দাঁড়ায় তাহলেও ওই বেচারারা অভ্যাসবশত হয়ত স্যালুট

ঠুকে চেকনাকার শাল কাঠের দরজাটা খুলে দেবে। কারণ ভি, আই, পিদের আইডেনটিটি চেক করার অধিকারটুকু মানুষ-জনের নেই।

হাঁটতে হাঁটতে চোখ আটকে গেল একটা বিরাট গাছের পাতায়। আরে এই গাছ তো আমি হিমালয়ে দেখেছি। এর নাম টুণ্ড। শাল, শিমূল, শিরিষের এই জঙ্গলে টুণ্ড গাছ এলো কোথা থেকে? দূরে এক শিরিষের ডালে বসে ধনেশ পাখি। এই শিরিষের পাশ দিয়েই দেখি একটা শুড়ি পথ সোজা নেমে গিয়েছে এনডং-এর দিকে। বিটবাবু বলেছিলেন, একটু সাবধান থাকবেন, মাকনা হাতি আছে গোটা দুয়েক। যে কোন মুহূর্তে বেরোতে পারে। বেরোল বেরোক। একটা মানুষ বড় জোর হাঁটতে পারে। দু ধারে বড় বড় গাছের গুঁড়ি। ঢেকি শাকের ঝোঁপ। হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে এসে দেখি ঘোলা জলের ওপর দিয়া টিয়ের ঝাঁক ওপারের জঙ্গলে উড়ে যাচ্ছে। চুপচাপ নদীর পাড়ে একটা বড় পাথরের ওপর বসে রইলাম। নদীর বুক থেকে একটা হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এসে গাছগুলোর মাথা নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বন এখানে নির্জন, শান্ত। কোন পাখির ডাকও শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ সব নির্জনতা টুকরো টুকরো করে দিয়ে শুনতে পেলাম রজনীর আর্তনাদ—কাঞ্চা আমায় ধর, আমি পড়ে যাচ্ছি। আর তখনই দেখতে পেলাম এনডংয়ের অপর পাড়ে শ দুই গজ দূরে মূর্তি নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সেই হাতিটা। হাওদা নেই। রজনীকে কোন রকমে এক হাতে ধরে রয়েছে মাহুত। পাগলের মত হাতিটাকে বসানোর চেষ্টা করছে। নেপালী ভাষায় কি বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমার ছুটে যাওয়া উচিত। কিন্তু হাতি ছাড়া এই পাগলা নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য। জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কি করব? কি করা উচিত? ওপারে রজনী, এপারে আমি। একবার ভাবলাম চিৎকার করে বলি রজনী আমি এখানে। পরক্ষণেই মনে হল, তাহলে স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য হবে এই মুহূর্তে এই পাহাড়ী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে করে হোক ওপারে গিয়ে পৌছান। হাতিটা মাহুতের নির্দেশ মানছে না। ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে মূর্তি নদীর দিকে। রোগা পটকা একটা মাহুতের হাতে ঝুলছে রজনী। যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়তে পারে। আর পড়লেই নদীর পাড়ের বড় বড় পাথরের চাঙড়ায় ধাক্কা খেয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাবে। নিজেকে যে কী ভীষণ অসহায়, অকৃজ্ঞ, দায়িত্বহীন ও বিবেকহীন বলে মনে হচ্ছে—লজ্জা করছে। অথচ সাহস নেই যে এগিয়ে গিয়ে কিছু করব। যে পাথরটার ওপর বসে

ছিলাম সেই পাথরটার মতই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম এক সময় হাতিটা মাহুতের নির্দেশ মেনে নিয়ে মূর্তি নদীর পাড়ে পা গুটিয়ে বসে পড়ল। মাহুতের হাত থেকে রজনী শুকনো মরা একটা ডালের মত খসে গেল নদীর পাড়ের বালি ও কাদায়। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কারণ এরপর রজনী উঠে বসবে। উত্তেজনা, ভয় ইত্যাদি কেটে গেলে যখন সহজভাবে চার দিকে তাকাবে তখন নির্ঘাৎ সবার আগে দেখতে পাবে আমি নামক এই কাপুরুষ স্বামীটিকে। তার আগেই আমাকে পালাতে হবে। যে করেই হোক। ধরা পড়তে চাই না। সে আরও লজ্জার। অভিজ্ঞ মাহুত নিশ্চয় আর কোন ভুল করবে না—ঠিক ফিরিয়ে আনবে।

শুঁড়ি পথ নিয়ে প্রায় ছুটছি। ঢেকি শাকের জঙ্গলে ট্রাউজারস বার বার আটকে যাচ্ছে। পায়ের হাওয়াই চপ্পলের একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। চপ্পল জোড়া জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। খালি পায়ে ছোট ছোট পাথরের টুকরো কাঁটার মত ফুটছে! একেই পায়ের তলায় প্রচণ্ড কড়া। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। চোখে পড়ল পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে রক্তে। এত রক্ত এল কোথা থেকে? কখন ফাটল? নীচু হয়ে দেখি ডান পায়ের গোড়ালির দু দিক থেকে দুটি জোঁক কামড়ে ধরেছে। টেনে ছিঁড়তে গেলাম। জোঁক দুটোর অর্ধেকটা খসে গেল। সেই সঙ্গে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। নুন না দিলে এই জোঁকের হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই পায়ের তলার পাথরের পরোয়া না করে, কড়ার কথা ভুলে গিয়ে নিজের চিন্তায় অধীর হয়ে এবার সত্যিই ছুটতে শুরু করলাম। গতকাল রাতের বৃষ্টির জল শুঁড়ি পথে জায়গায় জায়গায় জমে রয়েছে। কাদাজলে পা পড়তে, ছিটকে এসে জামা-কাপড় নোংরা হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুই আর মনে পড়ছে না। যে করেই হোক জোঁকের হাত থেকে নিস্তার চাই।

শুঁড়ি পথটা পার হতেই আবার এসে পড়লাম ডাকবাংলো যাওয়ার মূল রাস্তায়। যতীন দত্ত। আমাকে দেখে সাইকেল থেকে নামলেন। তারপর কাছে এসে বললেন: কি হয়েছে আপনার? ছুটছেন কেন?

: জোঁক।

: কোথায় দেখি।

ট্রাউজারটা গুটিয়ে তুলে দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গেই উনি বললেন এখুনি আপনি সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসুন। সামনে এন ভি এফ ক্যাম্প। ওখানে নুন, ডেটল, আয়োডিন অন্তত পাওয়া যাবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে পায়ে ডেটল মাখা তুলো গুঁজে বিটবাবুর সঙ্গে ফিরতে ফিরতে গরুমারা জঙ্গলের গল্প শুনলাম। আসাম রোডের ওপর চালসা বাজার। শিলিগুড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল। চালসা বাজার থেকে পাতাবাড়ি রোড সোজা চলে গিয়েছে ময়নাগুড়ির দিকে। ওই রাস্তার ডান দিকে বড়দিহি বিট, বাঁ দিকে গরুমারা। যতীনবাবু বেশীদিন এই বনে আসেন নি।

যদিও চাকরি করছেন প্রায় এগারো বছর বললেন, গরুমারা বিটে রয়েল-বেঙ্গল আছে একটা চিতা গোটা তিনেক। নেকড়ে একটা। দুটি দলছুট মাকনা হাতি। আটটা গণ্ডার। শ চারেক বুনো শুয়োর। তিনটি সম্বর। গোটা পঞ্চাশেক বারকিং ডিয়ার। হগ ডিয়ারের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশ। অন্তত চারটে বাইসনের হিসাব উনি জানেন। আর আছে সাপ। একটা লম্বায় বাইশ ফুট, আর একটা সতেরো ফুট, তৃতীয়টি পনেরো ফুট ও একটি বারো ফুট। দুঃখ করে বললেন, সপ্তাহখানেক আগে একটা কালনাগিণী ধরা পড়েছিল। প্রায় দশ ফুট লম্বা। ফণাটা প্রায় দশ ইঞ্চি। ধরার পর বাংলোর হাতার ওয়াচ টাওসারের গা ঘেঁষে বানানো লোহার জালের খাঁচায় রাখা হয়েছিল। জালের ফাঁক মাত্র দু ইঞ্চি। বিটবাবুর মুখটা করুন, কি বলব মশাই ওই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিলাম ডি এফ ও সাহেবকে উপহার দেব।

লোকটা জঙ্গল পাগল। প্রতিটি গাছ চেনে। প্রতিটি পাতা, লতা, গুল্ম। আমায় এক এক করে চেনাচ্ছিলেন। আমার ভাল লাগছে না। তাই ফস করে জিজ্ঞাসা করে বললাম : বিয়ে করেন নি মশাই ?

মূহূর্তে গাইড গম্ভীর মুখখানা কেমন লাজুক হয়ে উঠল। বললেন : করেছি।

: কতদিন ?

: মাসখানেক হল।

: তাহলে চলুন আপনার কোয়ার্টারে যাওয়া যাক।

বৌদির হাতের এক কাপ চা খাওয়া যাবে।

মুখটা এখন ম্লান ও বিষণ্ণ। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে বললেন. সে সুযোগ কোথায় ? গত বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে বিয়ে হল। তারপর আর ছুটি পাইনি।

: বাঁকুড়ায় কেঁদুয়াডিহিতে।

: কে কে আছেন বাড়িতে ?

: বাবা, মা, চার ভাই তিন বোন। বাবা বৃদ্ধ, অথর্ব। দুটি বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মেজভাইটা একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। তিনশ সাড়ে তিনশ মত পায়। আর আমি সাড়ে চারশ।

: পুজোয় বাড়ি গেলেন না যে ?

: ছুটি পাইনি। তাছাড়া বাড়ি গেলে এত লোককে এত কিছু দিতে হবে, সে সামর্থ কোথায়। তাই বাবার নামে তিনশটা টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাতে যা হয় হোক।

: স্ত্রী জন্য আলাদা কিছু পাঠালেন না ?

: পাঠানো যায় না। সম্ভব নয়। তাই রেবাকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম এবার পারলাম না, পরের পুজোয় নিশ্চয় একটা শাড়ি দেব।

গরুমারার দিনপঞ্জী :

৯ অক্টোবর। অষ্টমীর রাত :

এই জঙ্গলে সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার নেমে আসে। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন আর মোমবাতি। রজনী, নির্মল আর অনু দোতলায় ঝুল বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে। আমার ভাল লাগছিল না। নেমে এলাম। একতলায় ডাইনিং কাম হলঘরের মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল। খাওয়ার। চারধারে চেয়ার। চুপচাপ একটা চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। জানি রজনী এখন ওর সকালের অ্যাডভেনচার স্টোরিটা বলছে। শুরুতেই উঠে এসেছি। আসলে নিজেকেই আর সহ্য হচ্ছিল না। ভীষণ ভীরু আর কাপুরুষ। অথচ চোদ্দ বছর আগে এই রজনীর জন্য কি না করতে রাজি ছিলাম।

এম এ পাশ করে সদ্য একটা কলেজে পড়াতে ঢুকেছি। সাউথ ক্যালকাটায়। কুড়িয়ে কাঁচিয়ে মাইনে দুশ টাকা। মাইনেটা বড় নয়, নামের আগে প্রফেসর শব্দটা কৃষ্ণ নামের মত ঝংকার তোলে। ধুতির ওপর হাত গোটানো ফুল হাতা শার্ট পরে কলেজে যাই। চুল প্রায় দিনই শ্যাম্পু করা। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে একগুছি চুল আলতো ভাবে কপালের ওপর টেনে আনি। একটু হিরো হিরো দেখায়। নিজের তাই ধারণা। হাতে পেঙ্গুইন সিরিজের লেটেস্ট কোন ইকনমিক্স বা সোসিওলজির বই। বাসের টিকিট ভেতরের পাতায় গোঁজা।

এতে ক্লাসের ছাত্রদের চেয়েও ছাত্রীরাই বেশি মুগ্ধ হয়। স্যারের যেমন চেহারা তেমনি পড়াশোনা। মেয়েদের চোখে মুখে যত অ্যাপ্রিসিয়েশন ফুটে ওঠে ততই ছেলেদের চোখগুলো মশালে পরিণত হয়। পারলে এই নাবালক স্যারটিকে দুর্বাসা প্রসেসে ভস্ম করে দেয়।

জাপানের মেইনি রেসটোরেশন পিরিয়ডে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারটা বোঝার নাম করে রজনী টিচারস রুমে একদিন স্ট্রেইট আমাকে বলে বসল : স্যার আপনি একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

মেয়েটিকে রোজই ক্লাসে দেখি। দেখার মত। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ও রকম গড়ন সচরাচর চোখে পড়ে না। পাঁচ চার, সাড়ে চার হাইট। ছিপছিপে। রং ফেটে পড়ছে। কমলালেবুর কোয়ার মত দুটি ঠোঁট। রঙীন তাঁতের শাড়িতে ঠিক যেন একগোছা রজনীগন্ধা। অন্য মেয়েরা যখন আমার লেকচার নোট করে ও তখন কলম বন্ধ করে বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অস্বস্তি হয়। চোখে চোখ পড়লে। টের পাই ছাত্রদের কারো কারো ঠোঁটের কোণে হাসি ছুরির মত ধারালো হয়ে ওঠে। এই মেয়েটির ওপর সব ছেলেরই নজর। তাই প্রফেসরের কোন ভুলচুক কেউ বরদাস্ত করবে না। কিন্তু মুশকিল রজনীকে নিয়েই। প্রায় রোজই ক্লাসের পর টিচারস রুমে আসে পুরোনো লেকচারের পয়েন্টগুলো বুঝে নিতে। কেন ক্লাসে নোট করে না জানতে চাইলে বলে, নোট করতে গেলে ভালভাবে শোনা হয় না।

অন্য ছেলেমেয়েরাও আসে। কিন্তু তাদের আসাটা যেন খুবই স্বাভাবিক। রুটিন ম্যাটার। অথচ রজনীর ব্যাপারটা যেন ডিফারেণ্ট। স্যারের সঙ্গে একটু বেশি মাখামাখি। স্যারও ব্যাপারটা যেন এনজয় করেন। ভাল নিশ্চয় লাগে। ছাত্রী হলেও সুন্দরী মেয়ে তো। ভেতরে ভেতরে আতঙ্কিত হলেও মুখে একটা ডোণ্ট কেয়ার ভাব ফুটিয়ে হাসতে হাসতে বললাম, কেন বলো তো?

কোন্ কথা যে কাকে কখন বিপন্ন করে দেয় কে বলতে পারে। রজনীর ফরসা মুখটা মুহূর্তে টকটকে হয়ে উঠল। আমার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মনে হল যেন ওর সারা শরীর কাঁপছে। এখুনি পড়ে যাবে। বড় সাইজের একখানা চৌকোনো ঘর এই টিচারস রুম। পর পর টেবিল সাজানো। একটা টেবিল চেয়ার। কলিগরা কেউ বসে পড়ছেন, কেউ ঘুমোচ্ছেন। কেউ কেউ রেজিস্ট্রি খাতা, নোট নিয়ে ক্লাসে যাচ্ছেন, কেউ বা

এইমাত্র ক্লাস নিয়ে ফিরলেন। বাড়তি কোন চেয়ার নেই যে মেয়েটিকে বসতে বলব। আমি নিজেই উঠে দাঁড়ালাম—মনে হচ্ছে তুমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছো, কি ব্যাপার বলো তো ?

টেবিলে ওর দুখানা খাতা আর বই পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে বুকের কাছে দুহাতে শক্ত করে ধরে বলল, স্যার এখানে আর কিছু বলতে পারবো না। আমি যাই। ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

দিন দুই বাদে বাস থেকে নেমে কলেজে ঢুকবার মুখেই দেখি বুড়ো আমগাছের নীচে রজনী দাঁড়িয়ে। যেন কারো অপেক্ষায়। আমার ক্লাসের তাড়া। ধুতির কোচা শার্টের ঝুল পকেটে গুঁজে ছুটছি। কানে এল : স্যার।

থমকে দাঁড়ালাম। রজনী আমার দিকে তাকিয়ে। ঈষৎ কুণ্ঠার ছায়া চোখের কোণে।—কি ব্যাপার রজনী ?

বই-এর ভেতর থেকে একটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পরে পড়ে দেখবেন। তারপর বুকের কাছে বই-খাতাগুলো দুহাতে জড়িয়ে ধরে কোন রকমে ছুট্টে চলে গেল সিঁড়ির দিকে।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ছেলে মেয়েদের ছোট ছোট জটলা এধারে ওধারে ছড়ানো ছিটোনো। বোধহয় কারোরই চোখে পড়ে নি। তবু কেন জানি আশংকা হল, যদি কেউ দেখে থাকে ? এখুনি রটে যাবে স্যার ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে। হাতের পাতার ভেতরে কাগজটা দলা পাকিয়ে গেল। ক্লাসের তাড়াও আর মনে নেই। টিচারস রুমে গিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে বেয়ারাকে জল, চক আর রেজেস্ট্রি খাতাখানা দিতে বললাম। ঘামিয়ে গিয়েছি।

রাস্তার ধারের ঘর এই টিচারস রুম। কানে আসছে টুকরো টুকরো কয়েকটা শ্লোগান—প্রফুল্ল সেন গদি ছোড়ো, আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো। মনে হচ্ছে মিছিলটা আমাদের কলেজের ভেতরই ঢুকছে। আজ কি কোন ছাত্র দিবস। তাহলে তো ক্লাস হবে না। ক্লাস নিতে হবে না ভাবতেই আরাম লাগল। ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছাটাই উবে গিয়েছে। জলের গ্লাসটা ধরতে গিয়ে টের পেলাম ওই কাগজটা এখনো হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে রয়েছে। থাক জল পরে খাব। আগে দেখি কি লেখা আছে।

রজনী সে সব দিনের কথা আজ বোধহয় তোমার আর মনে নেই। তখন তুমি অন্য জগতে। আমিও অন্য ভুবনে ছিলাম। কষ্ট, দুঃখ, জটিলতা সবই

ছিল—ছিল না ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস। জানি এখন তোমার সকাল বেলার অ্যাডভেনচারের কাহিনী নির্মলকে ক্রুদ্ধ করে তুলছে। ওর মুখে ক্রোধও সুন্দর। অনুর চোখ নিশ্চয় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বিনু আর তিন্নি তোমাদের ঘিরে খেলছে। সন্ধ্যার বাতাসে বুনো গন্ধ ভাসছে। কালো আকাশ জুড়ে অজস্র জোনাকি স্থির হয়ে আছে। রান্না ঘরে হ্যারিকেনের আলোয় মালি রাম ছায়া হয়ে রয়েছে। আমি নির্জন হল ঘরে একা। যদি অনু একবার নীচে আসত।

তিন লাইনের চিঠি। গোটা গোটা অক্ষর মেয়েলি ছাঁদে পর পর সাজানো। কোন সই নেই। স্যার, কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে আসুন।—বিপিন পাল রোড। দোতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাট। তখন সব বলব।

একেই কি প্রেমপত্র বলে? এত সাহস কোথা থেকে পেল? তবে কি ক্লাসে আমার কোন দুর্বলতা ওর চোখে ধরা পড়েছে? ওর ফ্যামিলিই বা কেমন? মেয়েটি কি বোকা না ওভার স্মার্ট? অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাই সাধারণত বেপরোয়া হয়। রজনীর বাবা কি করেন? ওর আর কোন ভাই বোন আছে? এটা কোন ফাঁদ নয় তো?

একবার মনে হল বেয়ারাকে দিয়ে রজনীকে ডেকে পাঠাই। পরক্ষণেই খেয়াল হল, যদি অন্য ছেলে মেয়েরা কিছু মনে করে। কলেজের সিঁড়ি বেয়ে শ্লোগান উঠে আসছে। আজ আর তাহলে ক্লাস হবে না।

হলঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দোতলার কাঠের রেলিং টপকে ওদের কথাবার্তা নীচে নেমে আসছে। অনু খুব হাসছে। ওর হাসিও মমতায় নরম। শুনতে পেলাম রজনী বলছে, ত্যাখ ত্যাখ নির্মল বিনুর কোলে মাথা রেখে তিন্নি কেমন বসে আছে।

হাসতে হাসতে অনু বলল: ওরা এখন শোলের ধর্মেন্দ্র আর হেমা মালিনী।

: তবে এই হেমা মালিনী বয়সে ধর্মেন্দ্রের চেয়ে একটু বড়ই। রজনীও বলতে গিয়ে হেসে ফেলল।

আসলে আমি অনুকে চিনি না। ওর জন্য আমি কষ্ট পাই। একদিন কথা বলতে না পারলে সব কিছু ম্লান হয়ে যায়। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সব কাজ অর্থহীন হয়ে যায়। অথচ ও কত সহজ ভাবে সব কিছুই করে। তবে কি আমি ভুল করছি? ও কি আমাকেও স্তাবক মনে করে?

তোমার চিঠিটা পড়ে সেদিনও আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। রজনী কি মনে করে ওর মুখ চোখ, নাক, ভুরুর ভাঁজে আমি আঁটকে গিয়েছি। এখন যা আদেশ করবে তাই করব?

যাই ভাবি, করলাম তো সেই কাজই। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বিপিন পাল রোডে দোতলার সেই ফ্ল্যাটের কলিং বেলটা টিপতেই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে তুমি।

চার কামরার ফ্ল্যাট। দুধ সাদা লোমওয়ালা কুকুর ছানা পায়ে পায়ে। ক্রিম কালারের দেওয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করে গোড়ালি ডুব পুরু কাশ্মীরী কার্পেট। রট আয়রণের সোফা সেট, হাল্কা, ছিমছাম। বুককেসে রচনাবলীর সারি। মাথার ওপরে ঝাড় লণ্ঠনে নিয়ন।

রজনী তুমি একটুও অবাক বা বিস্মিত হও নি। যেন জানতেই আমি আসব। ঝরঝরে গলায় বললে, ভেতরে আসুন।

মোজাইক করা করিডোরের ধারেই বসার ঘর। ঘরের মাঝখানে বড় সোফাটার ওপরে আসন-পিঁড়ি করে বসে আছেন এক মহিলা। বয়স ধরা যায় না। সাদা জরজেটে ইতালীর রেনেসাঁ রজনী। একটা বই পড়ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বইটা একধারে সরিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকালেন। বিস্ময়ে আচ্ছন্ন চোখ জোড়ায় অতিথি আপ্যায়নের ভদ্রতা মাখানো।

রজনী বলল: মা আমাদের স্যার। তোমাকে বলেছিলাম উনি আজ আসবেন।

তুমি সেদিন কি কনফিডেণ্ট ছিলে। তুমি জানতে আমি আসবই। অথচ আমি তো কিছুই কমিট করি নি। সুন্দর মুখ সর্বদাই দাবি করে—পাওনা আদায় না হওয়াটাই বিস্ময়ের।

: বসো বাবা। রজনী তুমি ধনার মাকে চা জলখাবার পাঠিয়ে দিতে বলো।

উল্টো দিকের সোফায় বসলাম। সেণ্টার টেবিলে একটি মাত্র ছবি। সুনীল দাসের ঘোড়া। উদ্দাম, ছুটন্ত, হাওয়ার বেগ রেকাবে, পায়ের ক্ষুরে, পুচ্ছে।

: তুমিই বলছি। কিছু মনে করছ না তো। কত বয়স তোমার—তেইশ হয়েছে?

ভদ্রমহিলা কি আমাকে বিয়ের পাত্র ঠাউরেছেন। পরিচয় হতে না হতেই বয়স নিয়ে কেন টানাটানি। বিরক্তি চেপে বললাম, পঁচিশ চলছে অ্যাকচুয়াল থেকে দু বছর বাড়িয়েই বললাম।

উনি যেন আমকে পড়তে পারলেন। হেসে বললেন, তোমার বয়সে সবাই বয়স বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। যখন বয়স হবে তখন দেখবে, কমানোর জন্য কত না কষ্ট করতে হয়।

রজনী ফিরে এল। মায়ের পাশে বসল। মা ও মেয়েকে দেখে মনে হচ্ছে যেন দুই বোন। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টায় সেই কথাই বললাম, হঠাৎ দেখলে মনে হয় রজনী আপনার ছোট বোন।

রজনী লাজুক মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সবাই সেই কথা বলে।

ভদ্রমহিলা কি ওভার স্মার্ট না নির্বোধ? ঘণ্টাখানেক সেদিন ছিলাম। অনেক কথা হল। রজনীর বাবা কলকাতাতেই থাকেন, তবে আলাদা ফ্ল্যাটে। বুঝতে অসুবিধে হল না, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। রজনী একমাত্র সন্তান। রজনীর দাদামশাই নাম করা হার্ট স্পেশালিস্ট। মেয়ে ও নাতনিকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। রজনীর মা রাজি হয় নি। আত্ম-মর্যাদায় বাধা দিয়েছে। ভদ্রমহিলা একটা সুইডিশ কোম্পানির রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেকরেটারি। চাকরি করে সংসার চালান। রজনীর বাবা মেয়ের জন্য মাসে মাসে টাকা দিতে চেয়েছিলেন, উনি তা নেন নি। মেয়ে বাড়িতে এসে আমার গল্প করেছে। তাই শুনে মা একদিন নেমন্তন্ন করতে বলেছিলেন। তাই কি রজনী কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে আশংকার অছিলায় আমাকে ডেকে নিয়ে এল।

আমার বাবা রিটায়ার্ড স্কুল শিক্ষক। আমরা সাত ভাই, দুই বোন। আমিই সবচেয়ে ছোট। দাদারা কেউ গেজেটেড অফিসার, কেউ আছেন প্রাইভেট ফার্মে। ওপরের দুই দাদা কাগজে কাজ করেন। দুই দিদিরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মা নেই। বাবা আর আমি দুজনে এখন বাহান্ন বছরের ব্যবধান নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকি। এ সব কথা রজনী সেদিন তোমার মা আমার কাছে জানতে চান নি। পরে আমিই সব বলেছি। আমিই তোমাদের বাড়িতে কাজলকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

কাজল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একই বাড়ির রাস্তার দুই প্রান্তে আমরা থাকতাম। আমি যখন এম এ পড়ছি, কাজল তখন অ্যাসবেসটস শীট বিক্রির প্রসেস জেনে ফেলেছে। ওর বড়দা মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। ইউনিভারসিটিতে পড়তে পড়তেই লুকিয়ে চুরিয়ে মদ খেতে শিখেছি। খরচ

জোগাত কাজল। নাটকের দল গড়েছিলাম। প্রতিটি শোর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট আসত কাজলের পারস থেকে।

প্রথম যেদিন কাজলকে নিয়ে গেলাম, তোমার মা ওকে দেখে বললেন, তোমার বন্ধু রিয়েল হী-ম্যান।

কাজলের ছ ফিট হাইট আর চওড়া কাঁধকে এর আগে কখনো মনে হয় নি ঈর্ষার যোগ্য। সেই এখন মনে হল। সেদিনই মনে হল, তুমি কাজলকে বেশি যত্ন করছ। অথচ আমার বন্ধু বলেই তোমরা ওকে আদর-যত্ন করেছিলে, কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। খানিক বাদে অত্যন্ত তুচ্ছ একটা কারণ দেখিয়ে উঠে পড়লাম। কাজলও চলে আসছিল, আমিই ওকে জোর করে থাকতে বলে, বেরিয়ে এলাম।

আসলে আমি যে কি চাই, তাই বোধহয় জানি না। অকারণ অস্থিরতা আমাকে কুরে কুরে খায়। কাউকে বলতেও পারি না, নিজেও সহ্য করতে পারি না। পর পর দু দিন কলেজে গেলাম না। পাছে রজনী তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কাজল এলে, হেড অব দ্য ডিপারমেণ্টের বাড়িতে যাওয়ার অ্যাভয়েড করলাম। কিন্তু তৃতীয় দিনে আর পারলাম না। সন্ধ্যার পর আবার তোমাদের বাড়ি গেলাম। দেখি কাজল বসে আছে।

কাজল রোজই আসছে। শুধু আসছে না। তোমার মাকে মাসীমা বলে ডাকছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী উপন্যাস উপহার দিয়েছে। নাইট শোর টিকিট কেটে এনেছে। আমাকে দেখে বলল: জানতাম তুই আসবি। তোর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম সকালে বেরিয়ে গেছিস। এদিকে রজনী বলল তুই কলেজে যাচ্ছিস না। কি ব্যাপার? যাক গে প্রিয়াতে বেয়ারিম্যানে ফিল্ম দেখাচ্ছে। আমি চারখানা টিকিট কেটেছি।

: আমি যাব না রে। শরীর ভাল নেই। তোরা যা।

তুমি আমাকে ঠিকই ধরেছিলে। তোমার সারা মুখে আশংকা, কষ্টের ছাপ। অথচ মার সামনে, কাজলের উপস্থিতিতে কিছুই বলতে পারছি না। অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছ আমার দিকে। তোমার মা বললেন, ওর যখন শরীর খারাপ, কাজল আজ বরং সিনেমা থাক।

বাধা দিলাম আমি, তা হয় না, আপনারা আজ দেখে আসুন। আমি আর এক দিন যাব।

টের পেলাম কাজল ম্লান হয়ে গেল। রজনীর কথা আমার মুখে শুনে শুনে

ও ধরেই নিয়েছে আমি শীগগির বিয়ে করব। বন্ধুর হবু বৌকে সরল বিশ্বাসে এণ্টারটেইন করতে গিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

আসলে রজনী আমি অত্যন্ত কুটিল, নিষ্ঠুর। আমার মনের জটিলতা বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে পরিণত করে। নিজেকে বড় ভালবাসি। তাই যেখানে মনে হয় আমি সবটুকু পাচ্ছি না, সেখানে অসহ্য লাগে। মনে মনে প্যাঁচ কষতে লাগলাম, যে করেই হোক কাজলকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ওয়াচ টাওয়ারে উঠে এসেছি, টের পাই নি। রেলিংয়ে হেলান দিতে গিয়ে খেয়াল হল যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ঠিক নির্মল আর আমার আজকের সম্পর্কের মত। বেশি চাপাচাপি কারোরই বোধহয় সহ্য হবে না। লাটাই আর ঘুড়ির মাঝখানে সরু সুতোর মত বন্ধুত্বও ঝুলে থাকে। অথচ প্রথম আলাপের পর মনে হয়েছিল জাহাজের কাছি দিয়ে পরস্পরকে বেঁধে ফেলেছি। ছেঁড়াছেঁড়ির ভয় নেই।

রজনী সেই রাতের কথা তোমার মনে থাকার কথা নয়। আমিও বাড়ি ছিলাম না। সিনেমা হলের সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। নটা বেজে গেল, সাড়ে নটা। নিশ্চয় কোন গণ্ডগোল হয়েছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেই দেখি, বাড়ির সামনে ছোট একটা ভিড়। পাড়ার ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি ছেলে আমাকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে ছুটে এসে বলল, ট্যাক্সিটা ছাড়বেন না, এখুনি পি জি'তে যাব। বৌদিকে পি জি'তে নিয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিন্নির কথা মনে পড়ল। বৃদ্ধ বাবা। কি হয়েছে রজনীর? ট্যাক্সিওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে এলাম। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। পাশের বাড়ির বড় বৌদি আমার বসার ঘরে বসে আছেন। বললেন, রজনীর বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওকে পি জি'তে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে মেশোমশাই আছেন। তিন্নি আমাদের বাড়িতে।

হাসপাতালে যেতেই আমার ভয় করে। মায়ের সময় গিয়েছিলাম। লাল বাড়ি, সাদা দেওয়াল, অপরিচ্ছন্ন করিডোর, ঠাসাঠাসি বেড, সবুজ চাদর, ওষুধের গন্ধে হাত পা কাঁপে। রজনী তোমার মাকেও আমি ভর্তি করেছিলাম। ইউরেমিয়া। দুজনের কেউই আর ফিরে আসেন নি। সেই সময় তোমার বাবাকে প্রথম দেখি। আমাদের বিয়ের সময়ও উনি আসেন নি। তোমার মা আসতে বারণ করেছিলেন। রীতিমত হ্যাণ্ডসাম পুরুষ। কম কথা বলেন। চুপচাপ ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে ছিলেন তোমার মা'র বেডের পাশে। আর

কোনদিন আসেন নি। শ্মশানেও না। আমাদের বাড়িতেও না। মাঝে মাঝে মাঝে স্টেটসম্যানের পারসোনাল কলামে দেখি উনি এক মাস কি দু মাসের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন বা বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার চেম্বার অ্যাটেণ্ড করছেন।

তোমার দুর্ঘটনার বছর খানেক আগে আমি কলেজ ছেড়ে কাগজে রিপোর্টারির কাজে ঢুকেছি।

পোড়া কেস। পুলিশ পারমিশন ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি করতে চাইছে না। এমারজেন্সিতে গিয়ে দেখি তুমি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছ। আমার বৃদ্ধ বাবা অসহায় অবস্থায় এক কোণে দাঁড়িয়ে। একজন ডাক্তার গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। তাকে এক ভদ্রলোক যেন কি বোঝাচ্ছেন। সেই প্রথম দেখলাম নির্মলকে করডয়ের প্যান্টের ওপর হাওয়াই শার্ট, পায়ে চপ্পল। রজনীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন পাগলের মত রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরার জন্য ছোটাছুটি করছিলেন, তখন নির্মল তার গাড়ি থামিয়ে জানতে চায় এবার নাম বলুন। ওর গাড়িতেই রজনী হাসপাতালে এসেছে। এখন ডাক্তারকে বোঝাচ্ছে, পুলিশ কেস, হাসব্যাণ্ড সব হবে. আগে ভর্তি করে নিয়। ট্রিটমেণ্ট স্টার্ট করুন।

আমি এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, সব রেসপরসিবিলিটি আমার। পুলিশ ডাকতে হয় ডাকুন, আগে ভর্তি করে নিন!

আমার গলা তুমি শুনতে পেয়েছিলে। তোমার পরণে একটা শায়া। বুকের ব্লাউজটাও ছেঁড়া। পেটে, হাতে কে যেন ম্যাজেনটা রং গুলে লাগিয়ে দিয়েছে। পরে জেনেছি ওটা মারকিউরোক্রোম। জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থায় তখন তুমি।

রাত একটায় নির্মলের গাড়িতেই বাড়ি ফিরে এলাম। ব্যবসা করে, বিবাহিত। তিন্নি জেগেছিল। ওকে কোলে নিয়ে খুব আদর করল। যাওয়ার আগে বলে গেল, চিন্তা করবেন না, কাল বিকেলে হাসপাতালে দেখা হবে।

সেই বিকেলে অনুকে দেখলাম। স্বামী স্ত্রী যেন মেড ফর ইচ আদার। পর পর একুশ দিন ওরা হাসপাতালে এল তোমাকে দেখতে। এই কদিনেই আপনি থেকে তুই-ই। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা। নির্মলের অ্যাডভাইসে টেনশন দূর করার জন্য রাত্রিবেলা ড্রিংকে গলা ভেজাতে শুরু করলাম। আস্তে

আস্তে নেশা জমে উঠল। অনেক বছর পর যেন নির্মলের মধ্যেই কাজলকে আমি খুঁজে পেলাম।

সত্যি কথা বলতে কি কাজল তো কোন অপরাধ করে নি। আমি রাগ দেখিয়ে, অভিমান করে, হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়ে তোমার মা ও তোমার কাছে অনর্গল ওর নামে মিথ্যা কথা বলেছি। কাজল লম্পট, কাজল মদ্যপ, কাজল জুয়াড়ি। তখন রজনী তোমাকে আমার চাই-ই চাই। তার জন্য প্রাণের বন্ধুকেও হারাতে প্রস্তুত।

কাজল সব টের পেল। কিছুদিন বাদে ও আমার বাড়ি আর তোমাদের বাড়ি দু জায়গাতে আসা বন্ধ করে দিল। কাজল কেন আসছে না, আমি জানতাম। তোমরা জিজ্ঞাসা করলে বলতাম, ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছি। সব মিথ্যে, সব বানানো। কাজলের ব্যবসা কলকাতাতেই।

বিয়ের দিনও যখন এল না, তখন তুমিই জানতে চাইলে ও এল না কেন?

বাইরে তখন সানাই বাজছে। আমি রুক্ষ মুখ করে বলে উঠলাম, কেন কাজল না এলে বুঝি তোমার খারাপ লাগে?

আমার ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট, এতই নির্লজ্জ যে সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজেকে গুটিয়ে নিলে। বহুদিন আর তোমায় মুখে কাজলের নামও শুনি নি। অনেক বছর বাদে তখন তিন্নি সবে হয়েছে, তুমি গড়িয়াহাটে গিয়েছিলে তিন্নির জন্য কি যেন সব কিনতে। কাজলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ফিরে এসে বললে, কাজল সারাক্ষণ আমার কথাই জিজ্ঞাসা করছিল।

তুমি ওকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছিলে। তাতে ও বলেছে, না বৌঠান তুমি এখনো অদ্ভুত সুন্দরী। তোমার বয়স হোক, তারপর যাব।

আমি ক্যাজুয়ালি বললাম, কেন ওকে জোর করে নিয়ে এলেই পারতে। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে। আমি যা বলছি তা কতখানি সত্যি? সবটাই সত্যি ছিল রজনী। কারণ তোমার আমার সম্পর্ক ততদিনে অভ্যাসে অভ্যাসে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বেড পার্টনার-আর আমাকে রোমাঞ্চিত করে না। তাই তোমাকে হারানোর ভয়ও নেই। তবে কাজল শব্দটাও কিন্তু আমাকে নতুন করে কোনও আনন্দ দিল না। আমি তখন অন্য ভুবনে সাংবাদিকতার ক্ষমতায় মজে আছি।

এখন কিছু কিছু বুঝতে পারি। সারাক্ষণ হীনমন্যতায় ভুগি বলেই, যেখানে নিজেকে জাহির করতে পারি, যেখানে পাত্তা পাই, যেখানে নিজেকেই বড় মনে হয়, সেখানে ছুটে যাই। সেই সঙ্গে ভালো লাগে। পুরোটাই একটা

পোজ, ভণ্ডামি। যখন মনে হল রজনী তোমাদের বাড়িতে কাজলের ছায়া আমাকেও ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠছে, তখন আর ওকে সহ্য করতে পারলাম না। ওর সঙ্গ, বন্ধুত্ব সব অসহ্য হয়ে উঠল। কি করে ওকে সরাবো, তাড়াবো তাই আমার সর্বক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল।

ঠিক যে কারণে কাগজের অফিসে আমার কোন বন্ধু নেই। সব সাংবাদিকই তো পেশার জোরে ক্ষমতা-কেন্দ্রের কাছে ঘুর ঘুর করতে পারে। সেখানে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা বড় কঠিন। আমার কাগজের অরুণ সেন কলম লেখেন। এক ডাকে অরুণবাবুকে সবাই চেনে। রাস্তাঘাটে, অফিসে, বাড়িতে সর্বত্র তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা হয়। মানুষটা জীবিত অবস্থাতেই কিম্বদন্তী। যারা ওর লেখা সহ্য করতে পারে না, তারা বলে লোকটা সি আই এ-র দালাল। যাদের ভাল লাগে তাদের মতে নির্ভিক নিরপেক্ষ সাংবাদিক। ওর চেহারা, হাঁটা চলা, কথা বলার ঢং সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয়। আমার চেয়ে সারভিসে অন্তত দশ বছর আর বয়সে ছ-সাত বছরের সিনিয়র। শুনেছি চাকরিতে ঢুকেছিলেন ষাট টাকা মাইনের ফুরোণের কাজে। লেখা ছাপা হলে সারা মাসে কত কলম লেখা ছাপা হল তার ভিত্তিতে মাইনে। তবে কখনোই ষাট টাকার বেশি নয়। সেই অবস্থা থেকে খেটে খুটে আজ সাংবাদিক মহলের উত্তমকুমার। সে তুলনায় আমি যখন ঢুকেছি তখন অনেক কষ্ট বলে কিছু নেই। কাগজ দাপটে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। আমিও একজন ছড়িদার। তবু ওই অমায়িক ভদ্র মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করি। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ওর কথা উঠলে মুখ বেঁকিয়ে বলি, এতবড় মূর্খ আর দেখি নি। ওর লেখায় পড়াশোনার কোন ছাপ নেই।

যে কাগজ প্রতিদিন সকালে উনুনের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বা ঠোঙায় হয় পরিণত, সেখানে যে পাণ্ডিত্যের চেয়েও সহজ সরল কথায় মোদ্দা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার সঙ্গত ও জরুরি এ কথা আমার চেয়ে আর কে বেশি বোঝে। জেনে শুনে মানুষটাকে ছোট করার নির্লজ্জ ইচ্ছায় মরীয়া হয়ে উঠি। অথচ প্রকাশ্যে এ কথা বলার সাহস নেই। অফিসে অরুণবাবুর প্রচণ্ড খাতির। মালিকরা ওর কথার যথেষ্ট দাম দেন। ওর কথায় আমাদের প্রমোশন নির্ভর করে। হাঁটুগেড়ে বসে স্তাবকতা করতে পারি না বলে অফিসে তাকে অ্যাভয়েড করি। ভেতরে ভেতরে হিংসায় জ্বলে যাই।

আসলে রজনী আমি যে সময়ে বড় হয়েছি তখন চোখের সামনে এমন কেউ ছিল না যাকে দেখে মানুষ হতে পারতাম। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক।

সারাদিন স্কুল আর টিউশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মুখে বলতেন গান্ধী, নেতাজী, নেহরু, বিবেকানন্দ-র জীবনী পড়। সেই বাবাকেই দেখেছি পরীক্ষার আগে প্রাইভেট কোচিং-এর ছাত্রদের আগাম কোশ্চেন বলে দিয়ে টাকা কামাতে। ডিসেম্বরে এমনিতেই তরি-তরকারীর দাম পড়ে যায়। ওই সময় আমাদের বাড়িতে যেন মচ্ছব লেগে যেত।

দাদাদের দেখেছি ওপেনলি বাবার সঙ্গে ঘুষ নিয়ে আলোচনা করতে। এক এক দাদার বিয়ের জন্য কত বরপন আদায় করা হবে এই নিয়ে মাসের পর মাস বাড়িতে আলোচনা হত।

কি পড়ছি, কেন পড়ছি কিছুই জানতাম না। কেউ দেখিয়ে দেওয়ার ছিল না। শুধু শুনতাম এম এ পার্স করা চাই। না করলে স্কুল মাস্টারিও জুটবে না। একটা টোটাল আনপ্ল্যাণ্ড ব্যাপার। আমাদের বাড়ি বড় রাস্তার ওপর। একমাত্র পাকা ফ্ল্যাট বাড়ি। দু ধারে বস্তি। কাঁচা ড্রেন, খাটা পায়খানা। অসংখ্য উলঙ্গ রুগ্ন শিশু। সারাদিন সারারাত মাতলামি আর বউদের কুৎসিৎ ঝগড়া। ততগুলো মানুষ একসঙ্গে দল পাকিয়ে থাকে, এরা কেউ কোনদিন কাজ পাবে কি না, দু বেলা ভাত পাবে কি না, মানুষের মত বাঁচার সুযোগ পাবে কি না—এ সব কথা স্কুলে-কলেজে ইউনিভারসিটি বা নিজের বাড়িতে কোনদিন আলোচনা হতে শুনি নি। এখন মনে হয় তখন যেগুলো পাঠ্য বই হিসাবে পড়তে হোত সে সব রূপকথার গল্পো। ওই গল্পোগুলো কোনদিন বলে নি যে ওই মানুষগুলির সঙ্গে আমারও নাড়ির যোগ আছে। আমিও ওদেরই একজন।

ফলে দেহে মনে যতই বড় হতে লাগলাম, চারদিক থেকে শুধু একটি কথাই কানে বাজত কমপিটিশন। সবাইকে ঠেলে-ঠুলে নিজে যতটা পারো গুছিয়ে নাও। এই গুছিয়ে নেওয়ার ধান্ধাতেই শিক্ষকতা ছেড়ে সাংবাদিকতা। একই কারণে কাজলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তোমাকে। আর আজ তোমাকে সরিয়ে দিয়ে চাই অনুকে। কিন্তু আপাতত এই শেষ চাওয়াটার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে দুটি মানুষ—তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী রজনী আর নির্বান্ধব আমার শেষ বন্ধু নির্মল। তোমাদের কাউকেই ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। করতে গেলে যে ঝড়-ঝাপ্টা ফেস করতে হবে তার সামাল দেওয়ার মুরোদ যে আমার নেই তা জানি। তা ছাড়া অনুই বা কেন এত কষ্ট সহ্য করতে যাবে। দু-জনের ঘরেই দুটি খুঁটি আছে। খুঁটি দুটিও থাকুক আর পরকীয়া প্রেমের মধুপানও চলুক।

: বাবু

: কে ? ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি রাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কি রে ?

: রান্না হয়ে গেছে। সবাই আপনাকে ডাকছে।

: বল আমি যাচ্ছি।

তবু রাম গেল না। কি রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? তুই যা, আমি যাচ্ছি।

: না বাবু, রাত্রিবেলা জায়গাটা ভাল না। আপনি চলুন।

নিশ্চুপ হল। কেন ভাল না রে।

: তারা এ সময়টা বেরোন।

: বাবা ?

: ওই যাদের লোকে লতা বলেন।

: তুই কখনো দেখেছিস ?

: হ্যাঁ দেখেছি। এই তো সেদিন একটা কালনাগিনী—

বেরিয়েছিল।

কালনাগিনী ! শুনেই গাটা কেমন শির-শির করে উঠল। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি হাওয়াই চপ্পল। মাটি ঘেঁষে যারা আসে তাদের কাছে আঘাত করার পক্ষে সবচেয়ে সহজ আর মোক্ষম জায়গা। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে ওই বাংলো পর্যন্ত সরু পায়ে হাঁটা পথের দুধার সুরু হয়ে ঘাস। অন্ধকারে কোথায় পা ফেলতে গিয়ে কোথায় দিয়ে ফেলব। এমনি ভাবেই তো সারাজীবন অসতর্কভাবে পা ফেলে চলেছি। ছোবল তো খাইনি, বরং নিজেই বার বার গিয়েছি। তাহলে আমিই কী একটা সাপ ? ভাবতেই কেমন হাসি পেল। হো হো করে হেসে উঠলাম। মনে হল, আস্তে আস্তে পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা দেহটা লম্বা একটা নলে পরিণত হয়ে চলেছে। এখুনি ওই নলটা মাটিতে আছড়ে পড়ে এঁকেবেঁকে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়বে।

: কি হল বাবু ? রাম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। লজ্জা পেয়ে গেলাম। লজ্জা ঢাকার জন্য রাগ করে বললাম, কিছু হয় নি। তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন। যা। আমি যাচ্ছি।

রামের পেছন পেছন আমি হাঁটতে লাগলাম।

১০ অক্টোবর। নবমী

রজনীর হাতির অভিজ্ঞতা সবার মুখে ফিরছে। নির্মল খুব বকাবকি

করছে। কেন একা একা বেরোল। অনুরও অনুযোগ আমি যেহেতু স্বামী তাই গম্ভীর মুখ করে রয়েছি। যেন ভীষণ বিরকত ও ক্রুদ্ধ এসব ছেলেমানুষিতে। রজনীও দেখলাম ভীত। আর হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে যেতে চায় না। নির্মলই প্রস্তাব দিল চল আজ সবাই মিলে আমরা ভুটান যাই। নাগরাকাটা হয়ে ফুটশেলিং তারপরেই ভুটান। বড় জোর সোয়াশ কিলোমিটার।

সকাল সকাল বেরোবো যাতে সন্ধার আগে ফিরে আসা যায়। লাঞ্চটা সারব রাস্তায়। ব্রেকফাস্ট গরুমারায়। নির্মল রামকে ডেকে বলল, জলদি দুটো মুরগী কাটো আর ভাত। ব্যস। দশটার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।

রাম বলল, তার পক্ষে একা সব দিক সামলানো সম্ভব নয়। একজনও ফরেস্ট ওয়াচার আসেনি। তাই জল তোলা যায়নি। রান্না হবে কিসে?

নির্মল বলল, তুমি জেনারেটর চালিয়ে দাও। ট্যাংকে জল উঠুক। তারপর আমরাই হ্যাণ্ড পাম্প চালিয়ে বাথরুম, বেসিনে, কলঘরে জল পাঠিয়ে দেব।

এদিকে তখন ভুটান যাওয়ার কথা শুনে বলল, অনেকটা উঁচুতে উঠতে হবে। তার আগে একবার ডিসট্রিবিউটারটা দেখিয়ে নেওয়া দরকার। তা ছাড়া ট্যাংকে তেল আছে মোটে দশ লিটার। টাকা পেলে বেলা দশটার মধ্যে সব সারিয়ে ট্যাংক বোঝাই করে ফিরে আসতে পারে।

নির্মলের ধারণা ছেলেটা অসৎ পেট্রোল চুরি করে। গত তিন দিনই নাকি করেছে। আমিও একমত। গোড়া থেকেই তো দেখছি। শুধু টাকার ধান্ধা। নানা অছিলায় টাকা আদায় করে নেওয়া। নে বাবা নে—ফেরার সময় তোর ব্যবস্থা করে ছাড়ব।

ভুটান যাওয়া হবে শুনে রজনী দারুণ খুশী। অনু বহুবার এসব অঞ্চলে নির্মলের সঙ্গে ঘুরে গিয়েছে। ওর পছন্দ হল ডাকবাংলো। যদি তাড়াতাড়ি ভুটান ঘোরা হয়ে যায় তাহলে একবার হলং হয়ে আসব।

শুরু হল, শুরুতেই গাড়িতে উঠতে গিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলাম নির্মল বলছে: গাড়ি আজ আমি চালাব, তুমি আমার পাশে বসবে। তপন বসবে তোমার পাশে। রজনীরা বাকি সিটে।

চাপা অথচ ছুরির মত কঠিন গলায় জবাব দিল অনু—তুমি আবার সকালেই রাম গিলেছো?

: সে কথা হচ্ছে না অনু।

সে কথাই হচ্ছে। কাল রাতে তোমার শার্টের পকেটে কাম্পোজ ছিল একতাড়া। স্যুটকেসের ভেতরে দু বোতল রাম। সকালে দেখি প্রায় ছটা কাম্পোজ নেই। এক বোতল শেষ। তুমি তো একটা মাতাল। গাড়ি চালাবে কি?

: আমি কেঁন ঘুমের বড়ি খাই, মদ খাই তুমি জানো না অনু?

জানি তুমি কি বলবে। ওটা তো একটা প্লী মাত্র।

: প্লী নয় অনু বিশ্বাস কর: ব্যাংকের ওভার ড্রাফট, সিমেণ্ট কোম্পানীর ক্রমাগত তাগাদা। লোকসানের পর লোকসান। এতগুলো লোকের চাকরি আমার ওপর। টেনশনে টেনশনে আমার পাগল হওয়ার জোগাড়। আমি আর পারছি না। তাই বাইরে এলে সব ভুলে থাকার জন্য—

নির্মলের কথাগুলো শেষ হওয়ার সুযোগ পেল না। অনু বলে উঠল—ওটা তো তোমার সাজানো কথা। শুধু কি বাইরে বেরিয়েই খাও? কলকাতায় রোজ রাতে বাড়ি ফের কিভাবে? পাড়াশুদ্ধ লোক কি বলে জানো না? কেন তোমার জন্য তোমার বাবা মার কাছে আমাকে কথা শুনতে হয়?

এবার দেখলাম নির্মলও কঠিন হয়ে উঠছে: আমি তো মাতাল। তুমি কি? কেন রজনী রোজ কাঁদে?

: কি বললে? তোমার এত বড় সাহস! আমাকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা দুটো মাতাল। একজন ব্যবসার নামে, অন্যজন লেখার নাম করে মদ খাও। বেশ্যা বাড়ি পর্যন্ত যাও।

: বেশ করি।

: না বেশ কর না। আজ ভোরে আমি যখন ওয়াচ টাওয়ারে গিয়েছিলাম তখন তুমি রজনীর সঙ্গে কথা বলনি? বলনি রজনীকে তুমি ভালোবাসো? বলনি যদি তোমার বন্ধু আমাকে নিতে পারে তাহলে তুমি কেন রজনীকে ছুঁতে পারবে না?

: বলেছি। তার আগে জবাব দাও। ও যখন ওয়াচ টাওয়ারে বসে লিখছে, তখন তুমি কেন ওখানে গিয়েছিলে? নিশ্চয় নদী গাছপালা দেখতে নয়।

: তোমার বন্ধু কি তাহলে দুশ্চরিত্র? বল, সবই যখন দেখছো—তখন আমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে?

: সে কথা বিনুকে জিজ্ঞাসা করো। —বলতে বলতে নির্মল সোজা

গাড়িতে গিয়ে উঠল। আমি কাঠের সিঁড়ির ওপর কাঠের মত দাঁড়িয়ে। রজনী তিন্নিকে সাশাচ্ছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। যে নির্মলকে উদার, পাহাড়ের মত অবিচল মনে করতাম এখন দেখছি, সেই নির্মলও একটা ঠুনকো মাটির ঢেলা। বাইরে যতই উদাস ভাব দেখাক, আমার আর অনুর এই মেলামেশা ও আর সহ্য করতে পারছে না। তাই টেনশনের নাম করে ক্রমাগত ঘুমের বড়ি আর মদের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে। আসলে ওর ইগোতে লেগেছে। এতদিন পরস্ত্রীদের পুতুলের মত ট্রিট করে এসেছে। মুখে বলে আমি কর্মবীর, ধর তক্তা মারো পেরেক। যেই সেই পেরেক একটা নিজের ঘরের তক্তায় এসে সামান্য বিজেছে, অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর সব কিছু। কিন্তু স্বীকার করতে, প্রতিবাদ জানাতে বা বলতে ওর ভ্যানিটিতে লাগছে। সবচেয়ে খারাপ লাগল ডাকবাংলোর দুটি প্রান্তে দু জোড়া মানুষ-মানুষী পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করার সময় কেউই খেয়াল করিনি যে দুটি শিশু সব দেখেছে। সব শুনেছে। আবার আমাদের লজ্জাও করেনি তাদের কাছ থেকেই গোপনে সব খোঁজ খবর নিতে। গরুমারা ডাকবাংলোটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৪৭ ফুট উঁচুতে। এই সামান্য টিলাটাতে উঠেও দেখতে পাচ্চি কোথায় কত নীচে আমরা নেমে যাচ্ছি। নির্মল খোলাখুলি যে কথা বলতে পারছে না, তাই ঘুরিয়ে আমাকে ফেরত দিতে চাইছে। রজনীও কি আমাকে ঠেকানোর জন্য নিরুপায় হয়ে এই পথ বেছে নিল? কাকে দোষ দেবো? সব কিছুর মূল তো আমি।

ঠিক প্লেনে যেমন দুটি পরিবার নির্বাক বোবা হয়ে ছিলাম—এখানেও তাই হল। গাড়ি চলছে। কেউ কোন কথা বলছে না। নির্মল চালাচ্ছে। টের পাচ্ছি ওর হাত স্টিয়ারিং-এ খুব শক্ত নয়। বারণ করেও লাভ নেই। অনু সামনের সিটে জানালার ধার ঘেঁষে বসে। কোলে বিনু। পরনে বড় বড় লাল গোলাপ আঁকা একটা সিল্কের শাড়ি। মাখনের মত নরম গ্রীবার ওপর কালো চুলের ঢাল, চোখ ফেরানো দুষ্কর। ওদের দুজনের মাঝখানে বসে ড্রাইভার তপন।

পেছনের সিটে দু ধারের দুটি জানলায় আমি আর রজনী। মাঝে রাস্তা একেবেঁকে পাহাড়ে উঠছে। নাগরাকাটা ছাড়িয়ে এসেছি। রাস্তার দু-ধারে শাল গাছ। কোথাও জঙ্গল। কোথাও ইতস্তত ছড়ানো মাত্র। আর একটু বাদেই ফুটশিলিং। তপন বলল আপনি এবার গাড়িটা আমার হাতে দিন, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

: একটা শব্দও কোর না তপন—গর্জে উঠল নির্মল।

খানিক বাদেই ফুটশেলিং বাজার, ভুটান মহারাজার গেট ছাড়িয়ে গাড়ি ওপরে উঠতে লাগল। রাস্তার ডানধারে গভীর খাদ। বুনো ঝোপ আর নানা জাতের গাছে ঢাকা। দূরে বহু দূরে আকাশ ছুঁয়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বহু নীচে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদীর ঘোলা স্রোত। মাইল ত্রিশেক চলার পর গোম্ফা পাহাড় বলে একটা জায়গা এল। নির্মল গাড়িটা রাস্তার একধারে রেখে বলল, চল সবাই একটু পাহাড় দেখি। হাত-পা ছাড়িয়ে নিই।

আমরা নামলাম। নির্মলের হাতে একটা রামের ভরতি বোতল। অনু গম্ভার মুখে বিনুকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রাস্তার ধারেই ছোট ছোট পাথরের স্ল্যাব, যাতে গাড়ি খাদে না উল্টে পড়ে। তারই একটায় গিয়ে বসল। রজনী তিন্নিকে নিয়ে খাদের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখছে। জীবনে এই ওর প্রথম পাহাড় দর্শন। মুখ চোখ জুড়ে তিন্নি কলকল করছে। পাহাড়ী ঝোরা দেখে জিজ্ঞাসা করছে ওই জল কোথা থেকে আসছে? নীচের ওই নদীটাও কি এনডং?

বোতলের ছিপি আঙ্গুলের শক্ত চাপে খুলতে খুলতে নির্মল বলল: আয় একটু গলা ভিজিয়ে নিই।

: না থাক। তুইও আর খাস না নির্মল।

: তুই ও কি একটা মেয়েছেলে হয়ে গেছিস? শুনলাম তুই নাকি অনুকে কথা দিয়েছিস আর মদ খাবি না, বড়ি খাবি না? —বলতে বলতে খানিকটা কাঁচা রাম গলায় ঢোলে নিয়ে বোতলটা আমার হাতে এগিয়ে দিল নির্মল।

নির্মল আমাকে টেস্ট করছে। সত্যি অনুকে ভালোবাসি কি না? তাছাড়া ও জানে রজনী এই মুহূর্তে মুগ্ধ বিস্ময়ে পাহাড় দেখলেও, অনু সমস্ত অন্যমনস্কতার মধ্যেও তাকিয়ে রয়েছে এদিকে। নির্মল দেখাতে চায়, তুমি না খেতে নিষেধ করেছিলে, তোমায় না ও ভালবাসে, ছাখো ভালোবাসা কত ঠুনকো, কত সহজেই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়। বোতলটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। নির্মল-এর চোখ দুটো জ্বলছে।

: কি রে খাবি না? তাহলে ফেরত দে আমাকে।—হাতটা বাড়িয়ে দিল। তুই তো অনুকে ভালোবাসিস, অনুও তোকে চায়। তোরা প্রেম কর, আমাকে মদ দে।

সত্যি কথা আমরা কখনও সহ্য করতে পারি বলুন? এত বড় একটা

নেকেড ট্রুথের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। সত্যকে স্বীকার করার মত ক্ষমতা যে আমার নেই, সেটা বুঝতে পারছি। অথচ কয়েক ফুট দূরে যে চোখ জোড়া অনুনয়ে বিষণ্ণ, তাকেও কষ্ট দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে।

: কিরে শালা—তুই তো একটা মেয়েছেলে। দে আমার বোতল ফেরত দে।

কিছু ভাবলাম না। নির্মল এক ঢোক খেয়েছিল। বাকি বোতলটা উপুড় করে গলায় ঢেলে দিয়ে খালি বোতলটা ছুঁড়ে দিলাম নীচের নদীর দিকে। বোতলটা গিয়ে পড়ল ঠিক নদীর গা ছুঁয়ে একটা ঝোপের ভেতর। পাশেই একটা মরা শালগাছ। পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এলোমেলো বইছে। সমস্ত শরীরটা যেন একটা ফারনেস। শুধু মাথার কোষে পাহাড়ী নদীর ঢল। অসম্ভব শক্তিশালী লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পারি না, এমন কোন কাজ নেই। যে কোন লোককে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। যে কোন পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারি। আমার পক্ষে সব কিছু সম্ভব। ড্রাইভারটা গেলো কোথায়? তপন দেখি ড্রাইভিং সিটে বসে। শালা একটা চোর। রোজ পেটরোল মারছে। একটা না একটা পার্টসের নাম করে টাকা গিলছে। একবার শিলিগুড়ি ফিরি, তখন দেখে নেবো।

দূরে দাঁড়ালাম। দূরে যেখানে ঝোপটার ভেতরে বোতলটা পড়েছে, সেখানে বাঁ হাতের তর্জনী উঁচিয়ে বললাম: পারিস, ক্ষমতা আছে বোতলটা ওই ঝোপ থেকে তুলে আনার?

মনে হল চারশ থেকে সাড়ে চারশ ফুট নীচে ওই ঝোপ। ঝোপের আড়ালেই সেই নদী। নির্মলের চোখ দুটো খেলছে। আমায় ও পরীক্ষা করতে চায়। লেট হিম ডু। ঠাণ্ডা গলায় বলল: তুই পারিস?

পায়ে হাওয়াই চপ্পল। পাহাড় বড় অচেনা। যে কোন মুহূর্তে পাড় ভেঙ্গে পড়তে পারে। ব্যালান্স হারিয়ে যাবে। মাথার ভেতর সব কিছু কেমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কিছু ঠিক থাকবে না। একটা পাগলা রোদ শুধু চেপে বসেছে। তুমি শালা বড় ধুরন্ধর না। ভীষণ সাহসী। গায়ে প্রচণ্ড জোর। পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াও না। জঙ্গলের নাম করে বৌ-বাচ্চা এড়িয়ে ফুর্তি লুটে বেড়াও শালা। সত্যি-মিথ্যে নানা গল্প বলে অনুকে বিভোর করে রাখো না। আজ ছাড়ব না। আজ

মুখোমুখি পরীক্ষা হবে। কে জেতে কে হারে? ভাবতে ভাবতেই মনে হলো সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। পা টলছে। পাহাড়-গুঁড়োনো দেহের শক্তি আপনা আপনি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বললাম, পারি। চোখের সামনে ধাপে ধাপে শাল, শিমুল, শিরিষ আর নাম-না-জানা অজস্র গাছের বন যেন টলছে। এগিয়ে গেলাম রাস্তার পাড়ে। দুটো পাথরের স্লাভের মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ সোজা নেমে গিয়েছে চারশ, সাড়ে চারশ ফিট নীচে। বোধহয় এখানকার স্থানীয় লোকে ব্যবহার করে। দুধারে বুনো লতার ঝোপ। বেগুনি ফুলে ফুলে রঙীন। দূরে পাথরে সেই স্ল্যাবটার ওপর অনু বসে। অসম্ভব গম্ভীর মুখ। সামনের পাহাড় ছাড়া আর যেন কিছু ও দেখছে না। রজনীর চোখমন মনে হল উদ্ভাসিত—পাহাড়, নদী, জঙ্গল একসঙ্গে এতসব। কোনদিন তো দেখে নি, দেখতেও পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে যার ভরসায় এতদূর এসেছে, যাকে অধিকারে রাখার জন্য এত মরীয়া, সেই মানুষটাই আর এক ধরনের অধিকারের পরীক্ষা দিতে পাহাড়ের মাথায় পা রেখে নিজে জীবনটাকেই এই মুহূর্তে পণ রেখেছে—এ সব ও জানবে কি করে?

কানে আসছে নির্মলের টিটকিরি, কি রে শালা ভয় পাচ্ছিস? না পারিস তো যা গিয়ে গাড়িতে বোস। লেখার নাম করে প্রেম করে বেড়াস, পাহাড় লেখার পাতা নয়। এই নির্মল ছাড়া আর কেউ পাহাড় চেনে না।

নির্মল আর কিছু বলছিল কি জানি না, তার আগেই বুনো বেগুনী ফুলের হাওয়া, সরু শুঁড়ি পথের আলগা কাঁকর আর পাথুরে মাটিতে পা বাড়িয়ে দিয়েছি টের পাচ্ছি। পায়ের চপ্পলটা ছোট একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বেঁকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান পায়ের গোড়ালিটা গেল ঘুরে। কে যেন বহু উঁচু থেকে চীৎকার করে বলে উঠল: একি করলেন দাদাবাবু, এখনো বারন করুন। উনি যে মরে যাবেন।

পাহাড়, চার ধারের ঝোপ জঙ্গল কাঁপিয়ে নির্মল চীৎকার করে উঠল চোপ শালা। তুই ড্রাইভার—তুই কথা বলার কে?

বুঝতে পারলাম আমার বেচাল দেহটা গড়িয়ে চলেছে। বেগুনী ফুল যে এত কাঁটায় ভরা তার ওপর থেকে জানতে পারি নি। বুঝতে পারি নি। পায়ে চলা শুঁড়ি পথের ওপর শুধু আলগা আলগা পাথর। আমি যেন বুলডোজার, সব পাথর ঠেলতে ঠেলতে ক্রমে চলেছি। জানি না কি লতা। শেষবারের মত দু হাত দিয়ে চেষ্টা করলাম আকড়ে ধরতে। শিকড় সমেত উপড়ে এল।

আর তক্ষুণি একটা পাথরের কোণে কপালটা সজোরে গিয়ে ধাক্কা খেল। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ওই পাথরটাকেই ধরবার। রেল লাইনের ধারে যে সব পাথর থাকে তারই একটা বড় সাইজ মাত্র। হাতের টানে আলগা মাটি থেকে উঠে এসে সোজা নাকের ওপর পড়ল। রাস্তার দু ধারে যে কত গাছ মরেছিল কে জানত। দু তিন হাত অন্তর একটা করে কেটে নেওয়া গাছের গুঁড়িতে গিয়ে পড়ছি। মরা কালো ডাল-পালা টের পাচ্ছি মট মট করে আমার শরীর ভেঙ্গে চলেছে। এই আওয়াজ ঠিক শুনতে পাচ্ছি। জলের মত কি যেন ঠোঁটে লাগছে। তবে রাস্তার কোথাও কোথাও জল জমে আছে? জিভ দিয়ে চেটে নিলাম। ভীষণ নুন এই জল। আস্তে আস্তে সব কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—চোখ দুটোয় বড় যন্ত্রণা। শিরদাঁড়াটা কি ফেটে গেছে? পা কেন এত অবশ? আমি কোথায় যাচ্ছি? আর কত দূর? কেন কিছু ধরতে পারছি না? কেন একবারের জন্য অন্তত উঠে দাঁড়াতে অক্ষম? হাত দুটো কোথায় গেলো? এ কি হঠাৎ থেমে গেল কেন? কিসে আটকে গেলাম? মনে হচ্ছে একটা পাথর। কই এই পাথরটাতো সরে গেল না। কিন্তু আমার দেহের ওপরের অংশটা পাথরটার গা ঘেষে আস্তে আস্তে আপনা আপনি নীচে নেমে যাচ্ছে। আর কে যেন আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলছে, আপনার বাঁ দিকে ওই শালগাছটাকে জড়িয়ে ধরুন। আমি পারছি না আপনাকে ধরে রাখতে।

এত নীচুতে কে এসেছে আমাকে বাঁচাতে? নির্মল? এই প্রথম টের পেলাম কতটা ভালবাসি নিজের বন্ধুকে। দু হাত দিয়ে শাল গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে কোন রকমে বসলাম—তুই, নির্মল তুই।

: না দাদাবাবু, আমি তপন। আপনি গুঁড়িটা ছাড়বেন না। আমি আপনার পা দুটোকে এই পাথরের খাঁজে আঁটকে দিচ্ছি।

ধনুকের মত পাক দিয়ে আমার পা দুটোকে টেনে নিয়ে শালগাছ আর পাথরের ভেতরে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল তপন। হাঁপাচ্ছে ছেলেটা। ওর দু হাতে রক্ত। হাত দুটো ছড়ে একাকার। একহাত পাথরটার ওপরে রেখে অন্য হাতে শালগাছটা ধরে দেখি একটু করে নীচে নামছে। তারপর একটু বাদে পেছন থেকে ওর হাত দুটো এসে আমার মাথাটাকে তুলে ধরল। কোন রকমে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে আমাকে টেনে নিয়ে শাল গাছটার গায়ে ঠেসে ধরল। চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যাচ্ছে। একটু একটু করে আবার সব দেখতে পাচ্ছি। কানে আসছে, খুব কাছ থেকে কলসীতে জল ভরার

আওয়াজ। বুক ভরে বাতাস টানলাম। আহ কি ঠাণ্ডা। তপন আমি কোথায় রে ?

: নদী থেকে খানিকটা ওপরে দাদাবাবু। যেখানটায় বোতলটা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন সেই ঝোপটার কাছেই।

: কেউ টের পায় নি তো যে আমি পড়ে গেছি ?

: ওপরে তাকিয়ে দেখুন না, সবাই দেখছে আপনাকে।

সত্যিই তাই। অনু, রজনী, নির্মল, বিনু তিন্নি, আর কে একটা বুড়ি। তিন্নিটা কি কাঁদছে। রজনী ও রকম করছে কেন ? নির্মল ওকে কি বোঝাচ্ছে ? অনু এখনো এতো গম্ভীর ? সমস্ত শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে আমার। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। কোন রকমে বললাম : আমাকে একটু উঠতে সাহায্য করবি তপন ?

রোগা পটকা, পাতলা না-খেতে পাওয়া ছেলেটা পেছন থেকে আমার বগলে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে টানতে লাগল। শাল গাছটায় ঠেস দিয়ে পাথরের খাঁজে পা গুঁজে তপনের হাতের ভরে উঠে দাঁড়ালাম। এখন যেন আবার পায়ে শক্তি ফিরে পাচ্ছি। গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে মাথাটা পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম। সেই মরা শাল। তার পেছনে তপন। চারদিকে লক্ষ লক্ষ বেগুনী ফুল—আমার কোমর অবধি ডুবিয়ে দিয়ে ফুটে আছে। আর তোড়ে ঘোলা জল দিয়ে পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে সেই নদী। পাড়ে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই। যেখানে এখন দাঁড়িয়ে ঠিক তার দু হাজার ফুট নীচে। আর দু চার পাক গড়ালেই এতক্ষণে এই নদীর পাড়ে কয়েকটা মাংসের টুকরো হয়ে পড়ে থাকতাম।

: তপন একটা উপকার করবি ?

: বলুন দাদা।

: আমি খুঁজে পাব না। তুই একটু ওই বোতলটা খুঁজে দিবি ?

: না পারব না। আপনার ঘাড়ে কি ভূত চেপেছে ? আগে ওপরে উঠুন তো।

: না তাহলে আমি যাব না।

আমার কি মরতে ইচ্ছে হচ্ছে ? নইলে তপনের মুখটা আমার শেষ কথা কটায় কেন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, আপনি এই গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি খুঁজে আনছি।

বেগুনি ফুলের ঝোপে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল তপন। বাঁ হাত দিয়ে

চার পাঁচটা লতা একসঙ্গে ধরে ডান হাত দিয়ে অদৃশ্য মাটি ছাড়াচ্ছে। কিন্তু এত দেরী করছে কেন? ওই তো নির্মল নেমে আসছে। নির্মল এসে আমাকে বাঁচাবে? ওই-ই বোতলটা খুঁজে বার করবে? আমি হেরে যাব? সারা দেহের সমস্ত জোর গলায় টেনে নিয়ে বললাম: তপন তাড়াতাড়ি কর।

: করছি দাদা। আর একটু দাঁড়ান।

দাঁড়াব কি। নির্মল তো প্রায় অর্ধেকটা পথ নেমে এসেছে।

আর তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে পৌছে যাবে। শাল গাছটা ছেড়ে পাথরের ওপর দু হাতের ভর দিয়ে ওই বুনো ঝোপের ওপর শুয়ে পড়লাম। বুনো লতা-পাতার কষ কষ গন্ধ নাকে লাগছে। ডান দিকে যতটা পারলাম হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম। না এদিকে নেই। নিজেকে একটু ব্যালান্স করতে পারছি। আস্তে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে দেহটা বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে হাত বাড়াতে গিয়েই টের পেলাম হাঁটুর কাছে কি যেন একটা শক্ত জিনিস—তবে পাথর নয়। বাঁ-হাতটা দুই হাঁটুর কাছে আসতেই হাতটা গিয়ে ঠেকল সরু নলের মত কি একটা জিনিসে। মুখটা ওপরে তুলতেই দেখি সেই বোতলটা। আনন্দে, উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছে। বাঁ-হাতে বোতলটা ধরে ডান হাতে বড় পাথরটায় ভর রেখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, পেয়েছি রে তপন পেয়েছি।

: পেয়েছেন দাদাবাবু?—বুনো ঝোপের আড়াল থেকে ওর মুখটা জেগে উঠল। সামনে পঞ্চাশ ষাট ফুট দূরে নির্মল দেখি একটা কেটে নেওয়া গাছের গুঁড়িতে এক পা রেখে দু হাত দিয়ে বুনো লতা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে। মাথার ওপর বোতলটা তুলে ধরে বললাম—এই ছাখ। আমি পারি কিনা ছাখ।

: চুপ কর ইডিয়েট। ফেলে দে ওটা। এখুনি উঠে আয়। তুই কি মরতে চাস?

পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিতে নিতে তপন বলল, আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি। আপনি উঠুন। খুব সাবধান। আলগা পাথরে পা ফেলবেন না। এক সঙ্গে চার-পাঁচটা লতা জড়িয়ে ধরে উঠুন। কোন ভয় নেই। আমি পেছনে আছি।

নির্মল আগে, মাঝে আমি, পেছনে তপন। টের পাচ্ছি মাঝে মাঝে তপন আমায় পেছন থেকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। পাছে আবার পা হড়কে যায়। কতক্ষণ লাগল জানি না। এক সময় ওপরে ওঠে এলাম। তিন্নিকে জড়িয়ে

ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদছে রজনী। থেকে থেকে বলছে : এই জন্য বেড়াতে নিয়ে এসেছিলে ? আমি কি দোষ করেছি ? কেন এভাবে আমাকে তুমি মারতে চাও।

আমি সব কিছু সামাল দেওয়ার জন্য হাসবার চেষ্টা করলাম। যেন কিছু হয় নি। তপনের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে হাসতে হাসতে বললাম। আরে এটা তুলব বলে নেমেছিলাম। পা হড়কে গেলে কি করব ? মরি নি যে তাতো দেখতেই পাচ্ছ।

বিন্নুকে দু হাতে শক্ত করে ধরে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অনু। কঠিন গলায় বলে উঠল : একদিন ও, আর একদিন তুমি পালা করে মাতলামি করবে, আর তার খোসরত দিতে হবে আমাদের। কেন কিসের জন্য ? ওর বড় বড় চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। কথা বলতে বলতে আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টির মত ওই দুটি জ্বলন্ত চোখ কান্নায় ভেসে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ, কপাল কেটে গেছে, নাক ফেটে গেছে, সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, জামা-কাপড রক্তে মাখামাখি। কেন তোমরা আমাদের নিয়ে আস ? নিজেরা এলেই তো পারতে। তারপর মাথা ফাটাফাটি করে মরতে তো দুজনেই মরতে।

: অনু একটু চুপ করবে।—নির্মলের গলা কি সহজ ও স্বাভাবিক। রজনী কেঁদো না। তোমরা বাচ্চাদের নিয়ে এখুনি গাড়িতে ওঠো। ওকে এক্ষুনি ফুটশেলিংয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে নিশ্চয় ডাক্তারখানা আছে। তপন তুই পেছনে গিয়ে বস। আমি গাড়ি চালাচ্ছি।

: না তুমি চালাবে না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নিষেধ করে উঠল অনু, তুমিও তো মাতাল। একজন মরছিল, এবার সবাই মরবে।

: কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসবে কিনা ? রজনী তুমি তিন্নি, বিন্নুকে নিয়ে ওঠ। আমি চালাব। আমার হাত ধরে বলল, চ, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।

কিছুতেই ও গাড়িতে উঠবে না।—রাগে কাঁপছে অনু। রজনী হতভম্ব। বাচ্চা দুটোর চোখের জল গালে মাখামাখি। সেই ভুটিয়া বুড়ি কি যেন বলছে তপনকে।

গাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই উঠলাম। এক শর্তে অনু রাজি হল। আমার চিকিৎসার পর এই গাড়ি অনুকে নিয়ে সোজা শিলিগুড়িতে আগে যাবে। সেখানে ওর মাসতুতো দাদা থাকেন। দাদা টি-প্ল্যাণ্টার, অনু তাঁর ছেলেকে

নিয়ে ওখানে থাকবে। আর আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে যাবে না। ওকে নামিয়ে দিয়ে আমরা গরুমারায় ফিরব।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটি লণ্ঠনের চাপা আলো ঘরে। সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ। গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। দুটো ঘুমের ট্যাবলেট ডাক্তার দিয়েছিল। তাতেও বেশীক্ষণ ঘুম হল না। পাশের খাটের মশারি ফেলা। ভেতরে রজনী আর তিন্নি। বড় তেষ্টা পাচ্ছে। জানি অন্য রাতের মত আজও মাথার কাছে টেবিলে মালিরাম জলের জগ আর গ্লাস রেখে গিয়েছে। কিন্তু হাত বাড়ানোর ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

আস্তে আস্তে ডাকলাম : রজনী—রজনী—আমায় একটু জল দেবে। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

রজনী জেগেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। জগ থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসে ঢেলে আমার গালে একটু একটু করে ঢালতে লাগল। লণ্ঠনের চাপা আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ওর চোখ জোড়া লাল হয়ে আছে। ফুলে গিয়েছে চোখের চারধার। বোধহয় এতক্ষণ কাঁদছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম : ওরা কোথায় ?

: চলে গিয়েছে।

: কোথায় গেল ?

তোমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে তপনকে নিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছে। যদি রিটার্ণ ফ্লাইটের টিকিট না পায়, তাহলে ওখান থেকে দার্জিলিং চলে যাবে। কয়েক দিন পরে ফিরবে। তপন কাল সকালে গাড়ি নিয়ে ফিরবে।

: তুমি তপনকে বখশিস দিয়েছ কিছু রজনী ?

: ও মানুষ না, ভগবান। ওকে বখশিস দেওয়া যায় না। তোমার কিছু মনে নেই। গাড়িতে ওঠে তুমি পারস থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওকে দিতে গিয়েছিলে. ছেলেটার সে কি কান্না। কাঁদে আর বলে, দাদাবাবু আমি কি একটা ছোটলোক। ড্রাইভার বলে অপমান করছেন।

এই ছেলেটাকেই গত কয়েকদিন ধরে চোর ভেবে মনে মনে কত গালাগালি দিয়েছি।

শুনতে পাচ্ছি রজনী বলছে : তোমাকে বাঁচানোর জন্য, কারও কোন কথা না শুনে ওই শুঁড়ি পথটার ওপর পিঠ পেতে শুয়ে সটান নেমে গেল ছেলেটা। ওরও সারা দেহ চিঁড়ে-ফুটে একাকার।

: ওর চিকিৎসা হয়েছে?

: হয়েছে। নির্মল ডাক্তার ডেকে এনে তোমাদের তুজনেরই চিকিৎসা করিয়েছে।

: আচ্ছা রজনী ওই বুড়ি ভুটিয়াটা তপনকে কি বলছিল জানো?

: তপন বলল, বুড়ি রেগে গিয়েছিল। বলছিল এরা যখন পাহাড়ী জঙ্গল চেনে না, তখন কেন পাহাড়ে আসে? এরা কি মরতে চায়? বল তুমি বল, আমি বাধা দিয়েছি বলেই কি তুমি ওভাবে মরতে গিয়েছিলে? আমি আর কিছু বলব না। তুমি অমুকেই ভালবেসো।

বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাংলো বাড়ির কাঠের ছাদে বৃষ্টির আওয়াজে যেন মাদলের তাল। ভেতরে অঝোরে কাঁদছে রজনী। এখন ওই ওয়াচ টাওয়ারে লাম্বুনি গাছের নীচে এনডং নদী নিশ্চয় কানায় কনায় ভরে উঠেছে। এত রাতে কি কোন জন্তু আসবে সল্ট লিকে মুন চাটতে? যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে হাত তুটো। তবু তু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ভুল বুঝো না। স্নিগ্ধ সঙ্গসুধার অতিরিক্ত কিছু চাই নি। আর এই জঙ্গলে এসে মনে হয়েছিল সব ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। তা যে যায় না, সেটা বুঝতে পেরেছি।

আমার বুকে মাথা রেখে রজনী কেঁদেই চলল। আর আমি তু হাত দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ভাবছি অন্য একজনের কথা। অমুকে যেন কি একটা কথা আমার বলার ছিল। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ঘুমে চোখ আবার জড়িয়ে আসছে।

গরুমারার দিনপঞ্জী

১১ অক্টোবর দশমী

এখন বেলা দশটা। ফুটশালিং-এর ডাক্তারের সত্যিই হাতযশ আছে। খান-তুই ইনজেকশন দিয়েছিল, তাতে এখন শরীর বেশ ঝরঝরে। গায়ের ব্যথা অনেক মরে গিয়েছে। উঠে দাঁড়াতে পারছি, হাঁটতেও পারছি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখলাম নাকের ওপর একটা ব্যাণ্ড এইড লাগানো। কপালে ব্যাণ্ডেজ। তুই হাতে তিন-চার জায়গায় ব্যাণ্ড এইড। আর ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচেই বড় একটা ব্যাণ্ডেজ। পাজামা, পাঞ্জাবিতে আর সব ঢাকা। শুধু মুখের চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। আমি আর রজনী। টেবিলে চায়ের পট, কাপ ভর্তি গরম চা। দূরে বাগানে তিন্নি খেলছে। গত রাতের বৃষ্টির

পর আকাশ এখন একদম পরিষ্কার। নীল। দূরের পাহাড়ের সারিও আর এতটা ধূসর নয়। এনডং আর মূর্তি—দুই নদী ভর ভর্তি। চারপাশের জঙ্গল আরো সবুজ, আরো নিবিড়। এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি একদল হরিণ এনডং-এর পারে ঘাসের জঙ্গলে চরছে। রজনী হরিণের পাল দেখে খুশী। মালি রাম সামনে দাঁড়িয়ে। তখন থেকে রজনীর সঙ্গে কি কথা যেন বলেছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। ওর পুরো নাম পরিয়াগ পাশমল। বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। সেই বৃটিশ আমলে ওর বাবা এই জলপাইগুড়ির জঙ্গলে ওর মতই মালি হয়ে এসেছিল। এখন চৌকিদার। রামের জন্ম এই জঙ্গলে। বড়ও হয়েছে এখানে। বছর পাঁচেক হল মালির চাকরিটা পেয়েছে। খুব ছেলেবেলায় ওদের বিয়ে হয়। এতদিন বৌ ছিল দেশে। গত বছর নিয়ে এসেছে। বৌ এখন রামের বাবার কাছে আছে, কালামাটি ভিটে। ওদের প্রথা অনুযায়ী বৌ কখনো শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। শ্বশুরও পারবে না। আজ বিজয়া দশমী। হাজার ইচ্ছা থাকলেও রামের বাবা পুত্রবধূকে একবারের জন্যও ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাই যদি আজকের বিকেলটা ও ছুটি পায় তাহলে একবার কালামাটি গিয়ে রাত্তিরে বৌকে নিয়ে বেরোবে ঠাকুর দেখাতে। বিনুবাবু ছুটি দিতে রাজি। কিন্তু আমাদের অনুমতি ছাড়া ও যেতে নারাজ। শুনলাম, বিনুবাবু নিজেই নাকি একটু বাদে আসবেন।

আমার কিছুই ভাল লাগছে না। কথা, কথা আর কথা। রজনী ওকে ছুটি দিতে চায় দিক। আমি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। রজনী একবার বাধা দিয়ে বলল: এখনই আর বেরিয়ো না। তোমার অসুস্থ শরীর।

বললাম, শরীর ঠিক আছে। ওয়াচ টাওয়ারে একবার যাই ঘুরে আসি। আমাকে বাইরে দেখে তিন্নি বলে উঠল, বাপী আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া লনের চারধারে অজস্র ফুল—রং শুধু রং। মাঝখানে হাল্কা সবুজ রংয়ের সিল্কের ফ্রক পরা আমার তিন্নি যেন প্রজাপতির মত উড়ছে। সকালের রোদও ওর দুটি নরম হলদে গালে আলোর ঢেউ তুলেছে। সব কিছু এত জীবন্ত, এত সুন্দর, তবু সবই বিষণ্ণ। কিছুই আর ভাল লাগছে না। তিন্নি ছুটতে ছুটতে আসছে। আমার হাত ধরে একটু ঘুরবে। কত অল্পতেই খুশী। কত সামান্যতেই তৃপ্ত। আমার বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছোট ছোট দুটো মুঠিতে জড়িয়ে ধরেছে। হাঁটতে হাঁটতে মোরাম বিছানো পথটুকু পার

হয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম ওয়াচ টাওয়ারে। লাম্বনি গাছ, নীচের নদী, দূরের পুরুণ্ডি ঘাসের জঙ্গল, শালের মেলা সবই সেই একই আছে। কিন্তু সে তো বাইরে। ভেতরে ভেতরে সবই যেন বদলে গিয়েছে। এই জঙ্গল ঘেরা ডাক-বাংলোটার জন্যই এত চেষ্টা, এত লড়াই।

এই টাওয়ারে, এই রেলিংয়ে ভর দিয়ে প্রথম যেদিন এসেছিলাম, এখানে অমু আর আমি খানিক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। চুপচাপ, পাশাপাশি। কি দারুণ লেগেছিল। অথচ এই ভালো লাগাটাই আজ অসামাজিক, অন্যায়, পাপ। তবে কোনটা সামাজিক কোনটা ন্যায়, কোনটা পুণ্য? কিছুই আর ভাল লাগছে না। আজই ফিরে গেলে কেমন হয়। কিন্তু সব কটা টিকিট তো সেই ট্রাফিক অফিসার বি কে রায়ের কাছে। নিশ্চয় উনি বাগডোগরার স্টেশন ম্যানেজারের হাতে টিকিটগুলো দিয়ে গিয়েছেন। ব্যবস্থাও হয়তো করে দিয়েছেন। ব্যবস্থা মানে তো সেই চোদ্দ তারিখের—যেদিন আমাদের ফেরার কথা, তপন আসুক।

আমাকে যেন মোরামে ঢাকা পথটা দিয়ে হেঁটে আসছে। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েও শুনতে পাচ্ছি। চটি ঘষড়ানোর আওয়াজ। কাঠের পাটাতনে আওয়াজটা উঠে এল। ঘুরে দাঁড়ালাম। সামনেই বিটবাবু। সেই লাজুক লাজুক মুখ। পকেট থেকে একটা চিঠি বার করতে করতে বললেন, আপনার খুব বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল। কাল রাতে আপনার বন্ধুর মুখে শুনেছি।

কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলাম। আবার রেঞ্জ অফিসের চিঠি। মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি আর ইনফরমেশন মিনিস্টার দু-একদিনের মধ্যেই বাংলোয় আসছেন। আজ যদি বাংলোটা ভ্যাকেট করে দিই ভালো হয়।

বিটবাবুকে বসতে বলে, তিন্নিকে বললাম যাও তো মামণি তোমার মাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।

রজনী এল। পেছন পেছন মালি রাম। চিঠিটা দেখিয়ে বললাম, ভি আই পিরা আসছেন। আমাদের আজই চলে যেতে হবে।

চলে যাওয়ার কথা শুনে রজনীর ফর্সা মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, ভাল করে জঙ্গলটা দেখার আগেই চলে যেতে হবে?

লাজুক বিটবাবুও রজনীর দুঃখটা যেন টের পেয়েছেন। বললেন, কি করব বলুন। কলকাতা থেকে সব ভি আই পিরা আসছেন।

মালি রামকে বললাম, বৌদিকে একটু বাক্সগুলো গুছিয়ে নিতে সাহায্য কর। আমরা আজই চলে যাবো। ড্রাইভার ফিরলেই।

বিটবাবু রামকে রেজিস্ট্রীখাতা খানা নিয়ে আসতে বলে দিলেন। রজনী তিন্নিকে নিয়ে বাংলোয় ফিরে গেল।

গত কয়েক দিনের সব খরচ-খরচা চুকিয়ে দিয়ে রেজিস্ট্রীখাতায় সই করলাম। রসিদ নিলাম। বিটবাবু চলে গেলেন। এখন অপেক্ষা করে আছি কখন তপন ফিরবে।

মালপত্র সব গোছানো সারা। রাম দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলো। তপন ফিরল প্রায় বিকেল বিকেল। হাতে ওর একখানা চিঠি। নির্মলের। সেই হাল্কা ঠাট্টার সুর—তুই বাঘিনীকে নিয়ে এক সঙ্গে ঘোরা অসম্ভব। এবারের বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেলো। অনুকে নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছি। দেখি বরফ কুয়াশায় মাথাটা খানিক ঠাণ্ডা হয় কিনা। গাড়িটা পাঠিয়ে দিলাম। তোরা ইউজ কর। জানি তোর মন খারাপ লাগবে। কিন্তু কি করব। কলকাতায় ফিরে দেখা করব। টিকিট সব বাগডোগরার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে রইল। তোদেরগুলো ইচ্ছে মত নিয়ে নিস। চলি রে।

গাড়ি চলছে। কি অসম্ভব ফাকা লাগছে গাড়িটা। সামনের সিটে শুধু তপন একা। মালবাজারের পথে মালনদীর সেতু পেরোতেই দেখি। কয়েক শ' সাঁওতাল মাদল বাজিয়ে নাচছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের এক-একটা দল। মাঝে একটা করে কলাগাছ। হঠাৎ দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ওরা সাঁওতাল। সবারই পরনে প্যান্ট-শার্ট। মেয়েরাও রজনী, অনুর মত শাড়ি পরে রয়েছে। শুধু মাদল আর কোমর জড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতেই ওদের পরিচিতি। ওই নাচ শেষ হলে লাইন দিয়ে দেবী বিসর্জন শুরু হবে। আশ-পাশের বিভিন্ন বাজার, গঞ্জ ও গাড়িতে যত পুজো হয়েছে। সব পুজোর প্রতিমা এই নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হবে। নদীর অর্ধেকটা মজা। বাকি আধখানায় জল। মজা অংশে ছোটখাট মেলা বসে গিয়েছে। গজা, কচুরী, নিমকি, সিঙ্গাড়া, জিলিপির দোকানের পাশাপাশি, বাজি, পান-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদির স্টল। সেতুর ওপর, নীচে ওই মেলার প্রায় হাজার খানেক লোক ভিড় করে দাড়িয়ে রয়েছে। কেউ দেখছে সাঁওতালী নাচ, কেউ কেনা-কাটায় ব্যস্ত, কেউ বা বিসর্জনের জন্য করছে অপেক্ষা।

অন্ধকার নামছে। চারিদিকে অজস্র হ্যাজাক, লণ্ঠন আর মোমবাতি জ্বলে উঠল। মাদলের বোল থেমে গিয়েছে। বড় রাস্তা ছেড়ে প্রতিমা সমেত

এক-একটা লরি নীচে নদীর মরা খাতে নেমে যাচ্ছে। সামনে ঠিক কলকাতার মতই ছেলেরা কোমর দুলিয়ে নাচছে। তপন সাবধান করে দিল, একদিন চলুন দাদাবাবু। এরপর মাতলামি শুরু হবে। গাড়ির ওপর হামলে পড়বে।

রজনীর ইচ্ছা অন্তত একটা বিসর্জন দেখে যায়। গাড়িটা সেতুর একধারে দাঁড়িয়ে রইল। রজনীর ইচ্ছা মিটিয়ে আবার যখন গাড়ি স্টার্ট দিল, তখন পিচ রাস্তা আর আকাশ একাকার হয়ে গিয়েছে। হাল্কা ঠাণ্ডার প্রলেপ বাতাসে। রজনী খুব মন দিয়ে দেখছে বিসর্জনের মিছিল। তিন্নি গুনে চলেছে লরির সংখ্যা—এক, দুই, তিন, পাঁচ, দশ···। মিছিলের ভিড় কাটিয়েই গাড়িটা তীরবেগে ছুটে চলল শিলিগুড়ির দিকে। আজ রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কালকের ফ্ল্যাইটেই কলকাতা ফিরতে হবে। দশমীর রাতে একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমি চোখ বুজেছিলাম। শুনতে পেলাম রজনী বলছে: তোর বাপীর আজকাল প্রতিমা চাঁদ কিছু ভাল লাগে না। একটা নষ্ট ব্যাটাছেলে।

আর পারলাম না। বললাম: আহা কি হচ্ছে রজনী। তিন্নি সব শুনছে।

: থাম। তুমি আর মুখ নেড়ো না। আটত্রিশ বছরের বুড়ো। মেয়ের বাপ। সংসারে মন নেই।

: কোন দায়িত্ব কবে অস্বীকার করেছি?

: দায়িত্ব মানে কি শুধু টাকা দেওয়া? সে তো ওই তপনও ওর সংসারের জন্য করে।

: প্লীজ রজনী। তিন্নির জন্য অন্তত থাম।

: কি করে তুমি পারলে?

: জানি না।

: জানি না বলে এড়ালে চলবে না।

: কিছুই এড়াই নি। ওরা তো নেই। চলে গেছে।

: আবার তো কলকাতায় ফিরে দেখা হবে।

: আর কি সেই ভাবে কোনদিনও হবে?

রজনী কেন জানি না আর কিছু বলল না। দশমী নিশির চাঁদের আলোয় আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। তিন্নিটাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করে। গাড়ির এক কোণে চুপচাপ গা এলিয়ে পড়ে রইলাম। পেছনে ফেলে এলাম গরুমারার জঙ্গল—কয়েকটি দিন। কয়েকটি রাত।

সমাপ্ত